ডালি

বাংলার বিশিষ্ট কথা-শিল্পি-বৃন্দ
রচিত
নূতন গল্প

প্রকাশক—তারকদাস দত্ত
(বাণী ভবনের পক্ষ হইতে)
৫৯, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
মহালয়া, ১৩৫০

বাণী ভবন
মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—অজিৎকুমার বসু, বি. এ.
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কথা—

যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি—নবগোপাল দাস
আই. সি. এস.

দম্পতি—সত্যনারায়ণ সেন

প্রাণের দান—অনুরূপা দেবী

নিশ্চেতন মন—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্ঘটনার জের—নরেন দেব

অবর্ত্তমান—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

অপর্ণার উদ্দেশে—বুদ্ধদেব বসু

স্বপ্নের সমাধি—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড—রাধারাণী দেবী

আল্পনা—বরদা গুহ
রাসবিহারী মিত্র

রেখালঙ্কার—শিবদাস মজুমদার

সম্পাদনা—সাহিত্যিক-সঙ্ঘ

পরিকল্পনা—বাণী ভবন

মনুষ্যত্বের চরম অবনতি নিয়ে এমন দুর্দিন পৃথিবীতে আর আসেনি। যুদ্ধরত জাতি সকল সূচনা থেকেই বলে আসছেন, যুদ্ধ চালাতে হবে মানবতা রক্ষার জন্য। কিন্তু কোন্ ক্ষয়-ক্ষতিহীন মানবতা রক্ষায় সেইটাই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

আহার, বাস, বাসস্থান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাধনা, দেহ-মন, মানুষ বিশ্বের যা কিছু শ্রেষ্ঠসম্পদ আজ সবই সামরিক। এত বড় বর্বরতা, লজ্জা, দুঃখ মানুষের ইতিবৃত্তে রচিত হয়নি। সভ্য বলে গর্ব যাদের সীমাহীন, মনুষ্যত্বহীন এই শোচনীয় অবনতি তা'দের কেমন ক'রে এলো ভাবতেও কষ্ট হয়।

এই দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্যের দিনে মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা বিলাসিতা, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় নয়।

আমাদের শুভানুধ্যায়ী গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পাঠক-পাঠিকার অস্বাভাবিক আগ্রহে ও তাগিদে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল!

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়ের সহযোগীতা ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশ সম্ভব ছিল না, এজন্য তাঁর নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

বাণী ভবন

যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি

নবগোপাল দাস
আই. সি. এস

সারাটা পথ অরিন্দম অনীতার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহার অনীতা—অতি আদরের অনীতা—অবশেষে তাহাকে জানাইয়াছে যে অরিন্দম ছাড়া আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না, তাহাদের রক্ষণশীল পরিবার যতই আপত্তি করুক্ না কেন। আর অরিন্দম জানে তাহার নিজের পরিবারের দিক হইতে অনীতাকে অঙ্কলক্ষ্মী করার পথে কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না, তাহার বিধবা মা শুধু দেখিতে চান্ খোকা যেন শীঘ্র বিবাহ করিয়া সংসারী হয়, যাহাকেই সে পত্নীর আসনে বসাইতে মনস্থ করিবে মা সানন্দে তাহাকেই গৃহে বরণ করিয়া নিবেন।

অরিন্দমের কাণের কাছে ভাসিতেছিল অনীতার টুক্‌রা টুক্‌রা কথা, মনমাতানো ঈষৎ হাসি। চক্ষের সম্মুখে সে দেখিতে পাইতেছিল অনীতার সঙ্গে তাহার শেষ কথা বলার দৃশ্যটি। কি অসঙ্কোচে অনীতা বলিয়াছিল, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি সব দিক ভেবে আমার কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়েছি। তোমাকে আমি ভালবেসেছি, ভালবাসার অপমান আমি করব না কিছুতেই।

উনিশ বছরের মেয়ে, কিন্তু কী গভীর তাহার অনুভূতি! বাবার অপ্রসন্নতা, মায়ের চোখের জল কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে

পারিবে না তাহার প্রেমনিষ্ঠা হইতে। অরিন্দম পুলকবিহ্বল হইয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর ছোটখাট অসুবিধা, ক্লেদ কিছুই যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না, সে ভাসিয়া চলিয়াছিল এক মর্ত্ত্যের স্বর্গে।

তাই কাঠগোদাম ষ্টেশনে যখন সে দেখিল তাহার বন্ধু কামাখ্যা উপস্থিত নাই তখনও সে এতটুকু অপ্রসন্ন হইল না। যাত্রীবাস্‌এর তৃতীয় শ্রেণীতে সে উঠিয়া পড়িল অম্লানচিত্তে। সে আশা করিয়াছিল নৈনিতাল মোটরবাস্ জংশনে বন্ধুর দেখা মিলিবে। কিন্তু সেখানেও সে কামাখ্যার পরিচিত মুখখানা দেখিতে পাইল না। অনন্যোপায় হইয়া সে কুলীকে আদেশ দিল নিকটস্থ কোন এক হোটেলে যাইতে।

জুন মাসের মাঝামাঝি, নৈনিতাল সহর শৈলবিহারী কর্ম্মচারী ও স্বাস্থ্যান্বেষীদের সমাগমে গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। কুলী যখন অরিন্দমের হোল্ডঅল্ এবং সুটকেশ নিয়া লেক্‌ভিউ হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ম্যানেজারবাবুর অফিসকামরার ভিতর অসম্ভব ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ ম্যানেজার এত যাত্রী আসিয়া পড়ায় মনে মনে পুলকিত হইলেও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাদের বিচিত্র এবং মাত্রাহীন সব দাবীতে। অবশেষে তাঁহার হোটেলে যে কয়টি ঘর খালি ছিল সবই অভ্যাগতদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আর কোন ঘর খালি নেই এখন, আমায় মাপ করবেন, আপনারা অন্য কোন হোটেলে আপাততঃ ব্যবস্থা ক'রে নিন্। দিন দুই পরে আবার আমার কাছে খোঁজ করবেন, তখন হয়ত দু'চারটে ঘর খালি হ'তে পারে।

লেক্‌ভিউ ·হোটেলের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে নৈনি লেক্‌এর ঠিক উপরে ইহার অবস্থিতি এবং এখান হইতে গোটা লেক্‌টার শোভা

দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া এখানকার রেট্ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পকেটের ক্ষমতাবহির্ভূত নহে। এখানে যে যাত্রীদের ভিড় হয় তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

অরিন্দম ছিল সকলের পশ্চাতে। ম্যানেজারবাবুর শেষ কথা শুনিয়া সেও প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু তাহার কুলীটা চোখ টিপিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিল। বলিল, বাবু, আপ্ জ'রা ঠহ্‌রিয়ে—

লোকের স্রোত যখন অপেক্ষাকৃত কমিয়া গেল তখন কুলীটা অরিন্দমকে বলিল, বাবু, আপ্ ম্যানেজার সাব্‌কা সাথ বাত্ কিজিয়ে, এক কামরা খালি হ্যায়।

স্থানীয় কুলী, হোটেলের আঁটঘাট নিশ্চয়ই তাহার জানা আছে, তাহা ছাড়া এই হোটেলে থাকিতে পাইলে সে অনাবিল আনন্দে লেকের দিকে তাকাইয়া অনীতার স্বপ্নে ডুবিয়া থাকিতে পারিবে, কাজেই অরিন্দম স্থির করিল ম্যানেজারবাবুকে সে নিজে প্রশ্ন করিয়া জানিবে, থাকিবার মত নিতান্ত চলনসই একটা ঘর পাওয়া যাইবে কি না।

ভাঙা ইংরেজীতে ম্যানেজার যে জবাব দিলেন তাহার সারার্থ এই, ঘর সত্যই খালি নাই, তবে একটা ডবল স্যুইট্ আছে, যদি অরিন্দমের আপত্তি না থাকে সে সাধারণ ভাড়ায়ই সেখানে থাকিতে পারে।

—আপত্তি? আপত্তি হবে কেন?...বিস্মিতস্বরে অরিন্দম প্রশ্ন করিল।

—দেখুন, আপনি বিদেশী, আপনাকে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি। যে স্যুইট্‌টার কথা বল্‌ছি তার একটা ইতিহাস আছে। গেল বছর ওখানে এসেছিলেন একজন অধ্যাপক, আপনাদের বাংলা মুল্লুকেরই লোক, আর তাঁর স্ত্রী। দু'জনে বেশ ভাব ছিল, তারপর হঠাৎ কি হ'লো জানিনা,

ভদ্রমহিলা একদিন রাগ ক'রে চলে গেলেন নৈনিতাল ছেড়ে, আর অধ্যাপক ভদ্রলোক কাউকে না ব'লে নিরুদ্দেশযাত্রা করলেন যেদিকে তাঁর দু'চোখ যায়, আর ফিরলেন না। সেই অবধি সবাই বলে আমার হোটেলের ঐ সুইট্‌টাতে নাকি ভদ্রলোকের অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়ায় এবং কেউ সেখানে যেতে চায় না। ······এই ত মাস তিনেক আগে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সস্ত্রীক সেখানে এসে উঠেছিলেন, এই কাহিনী শোনা সত্ত্বেও। প্রথম রাত্রিতেই তাঁর স্ত্রী কার যেন ছায়া দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন এবং পরদিন ভোরবেলায় তাঁরা দু'জনে এই হোটেল ছেড়ে পলায়ন করেন!

—আশ্চর্য্য ত!

—আশ্চর্য্যের বিষয় বই কি!····· ম্যানেজারবাবু বলিয়া চলিলেন। —সবচেয়ে মজার কথা এই যে ঐ সুইট্‌টিতে ছাড়া আর কোথাও এমন অনৈসর্গিক ঘটনা ঘটেনি। সব সময় ঐ সুইট্‌টি তালাবন্ধ ক'রে রাখি, বহুদিনের পুরানো হোটেল, তুলে দিতে মায়া হয়। একটি সুইট্‌এর ভাড়া না হয় নাই পেলাম, আপনাদের অনুগ্রহে বছরের ছয়টি মাস অন্যান্য কামরা আর সুইট্‌ থেকে যা' আয় হয় তাতে আমাদের মোটামুটি বেশ চলে যায়।

—আমার কোনরকম কুসংস্কার নেই, তাছাড়া কোন রহস্য যদি এর মধ্যে থেকে থাকে তবে তার অবগুণ্ঠন খুলে ফেল্‌বার সুযোগ পেলে আমি বরং আনন্দিতই হব।···অরিন্দম বলিল।

—তাহ'লে আপনি ঐ সুইট্‌টা নেবেন?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সাত নম্বর সুইট্‌, হোটেলের দোতলায়, লম্বা কাঠের বারান্দার

একপ্রান্তে। ঘরের দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছে, অব্যবহারের চিহ্ন তালাটির মধ্যেও প্রকট। অরিন্দম স্থইট্‌টার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নৈনি লেক্‌এর দিকে তাকাইল। নিতান্ত অজ্ঞাতে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, বাঃ, চমৎকার!

ম্যানেজারবাবু অরিন্দমের পিছনে পিছনে আসিয়াছিলেন। তিনি অরিন্দমের প্রশংসমান চক্ষু লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এখান থেকে ভিউ সত্যি সুন্দর, মিঃ চ্যাটার্জ্জি। ...দুঃখের বিষয় এই কোণটাতে কেউ আর থাক্‌তে চান্‌না, কারণ ত আপনাকে একটু আগেই বলেছি। এবার আপনি যদি লোকের ভুল ভেঙ্গে দিতে পারেন তবে আমারও মস্ত উপকার করে যাবেন, যার জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌ব।

—দেখা যাক্ কতদূর কি হয়। ...অরিন্দম মৃদু হাসিয়া বলিল।

বয় আসিয়া তালাটা খুলিয়া দিল। ম্যানেজারবাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে অরিন্দম ঘরে ঢুকিল।

তিনখানা ঘর নিয়া এই স্থইট্‌টি। প্রথমে একটি বসিবার ঘর, সেখানে আছে একটি ফায়ার প্লেস্, খানচারেক চেয়ার, একখানা গোল টেবিল এবং গোটা দুই টিপয়। তাহার পিছনে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি শোবার ঘর, দু'খানা লোহার খাট, একটি ড্রেসিং টেবিল এবং একটি আলমারী তাহার একমাত্র আস্‌বাব। শোবার ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন একটি বাথ্‌রুম।

—আপনার থাক্‌বার কোন অসুবিধে হবে না, আর বয়্ এখ্‌খুনি সব ধূলো আবর্জ্জনা পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যাবে।

—না, অসুবিধা ত হবেই না, বরং আমি এখানে একটু বেশী আরামে

থাক্‌ব। আর এই ত বস্‌বার ঘর থেকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি লেকের জল, পাহাড়ের পাইনশ্রেণী, পাহাড়ের গায়েঘেঁষা মেঘের ঢেউ। চমৎকার লাগ্‌ছে। · অরিন্দম বলিল।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি সমাধা করিয়া অরিন্দম অনীতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। পরস্পরকে ধরা দিবার পর অনীতার কাছে এই তাহার প্রথম চিঠি।

তাহার মনের পুলক, তাহার স্বপ্নমদির দৃষ্টিভঙ্গী, আলোবাতাস জল মেঘ সব কিছুকে নূতনরূপে দেখিবার উদগ্র কামনা, এবংবিধ সংলগ্ন অসংলগ্ন কথায় চিঠির প্যাড্‌এর তিনটি পৃষ্ঠা ভরিয়া সে অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্য্যের সহিত লিখিল লেকভিউ হোটেলের নিষিদ্ধ সাতনম্বর স্যুইট্‌ আবিষ্কার করার কথা। লিখিল, যদিও আমি খুব সাহস সঞ্চয় ক'রে ম্যানেজারবাবুকে বলেছি আমার কোনরকম কুসংস্কার নেই, তবু তোমায় সত্যি ক'রে বল্‌ছি, অনীতা, একটা অশরীরী ছায়ার স্পর্শ যেন আমি অনুভব কর্‌ছি। তুমি এখন কাছে থাক্‌লে আমি বোধ হয় সাহস পেতুম অনেকখানি।

বৈকাল বেলায় অরিন্দম বাহির হইল নৈনিতাল দেখিতে। লেক্‌টার চারিপাশে একবার পরিক্রমণ করিয়া আসা ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহার গতি ব্যাহত হইল একটা জায়গায় যেখানে শাদা পাথরের উপর লাল অক্ষরে খোদাই করা রহিয়াছে, পথিকগণ, সাবধান, ইহার পর যাওয়া বিপজ্জনক, এখানে ল্যাণ্ডস্লিপ হয়েছিল!

নৈনিতালের ইতিহাস অরিন্দমের জানা ছিল না, কাজেই সে এই নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না। তবে সরকারী হুকুম, ইহা

অমান্য করা সমীচীন হইবে না, এই ভাবিয়া সে শান্ত সুবোধ বালকের মত সেখান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অরিন্দম হোটেলে তাহার স্যুইট্‌এ ফিরিল।

তাহার ঈপ্সিত পরিক্রমণে বাধা পড়িবার জন্যই হউক, বা ম্যানেজার বাবুর কাহিনীর জন্যই হউক, অরিন্দম যেন হঠাৎ পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্রবোধ করিতেছিল। রাত্রিতে কিছু খাইবে না বয়্‌কে জানাইয়া দিয়া সে স্থির করিল শুইয়া পড়িবে।

বাতিটা নিভাইয়া বিছানায় আসিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তাহার মনে হইল রাত্রির কালো যবনিকা ভেদ করিয়া কে যেন তর্জ্জনীসঙ্কেতে তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, আমি এই ঘরগুলির আবেষ্টনী ছেড়ে কিছুতেই চলে যেতে পারছি না, যতদিন না আমি একজন শ্রোতা পাচ্ছি, যে আমার কাহিনী একটু দরদ দিয়ে শুনবে।

অরিন্দমের সমস্ত গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। ম্যানেজারবাবুর প্রত্যেকটি কথা তাহা হইলে সত্য, তাহার মধ্যে অতিরঞ্জন নাই এতটুকুও!

সে বিহ্বলভাবে বাহিরের দিকে তাকাইল। সেখানে তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছে না, আর দূরাগত সঙ্গীতের রেশ ভাসিয়া আসিতেছে রেডিয়োর অনুগ্রহে। নিজেরই মনের ভুল এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে কম্বলটা গায়ে টানিয়া দিবে, এমন সময় আবার শুনিতে পাইল সেই স্বর, অনুনয়ের সুরে। যেন বলিতেছে, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ ক'রে তুমি একবার ড্রেসিং টেবিলটার প্রথম ড্রয়ারটা খুলে দেখ, আমার কাহিনী শুনে আমাকে মুক্তি দাও...মুক্তি দাও ...

ডালি

মন্ত্রমুগ্ধের মত অরিন্দম বিছানা ছাড়িয়া ড্রেসিং টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। বাতিটা জ্বালিয়া প্রথম ড্রয়ারটা খুলিবার চেষ্টা করিতেই দেখিল ড্রয়ারটা তালাবন্ধ।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ম্যানেজারবাবুর কাছে চাবিটা চাহিবার জন্য, হঠাৎ তাহার মনে হইল নিজেরই কোন একটা চাবি দিয়া খুলিবার চেষ্টা করিলে হয় না?

চাবির গোছা হইতে একটির পর একটি চাবি লাগাইতেই ড্রয়ারটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। কম্পিত কৌতূহলে ডালাটা টানিয়া বাহির করিতেই অরিন্দম দেখিল সেখানে রহিয়াছে এক তাড়া কাগজ, আর একখানা চিঠি, বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা।

বিছানায় ফিরিয়া যাইয়া গায়ের উপর কম্বলটা টানিয়া দিয়া অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় অরিন্দম প্রথম পৃষ্ঠাটি খুলিল—আত্মচরিতের ভঙ্গীতে লেখা অতি বিচিত্র এক কাহিনী—

জীবনস্মৃতি লেখার স্বভাব আমার কোনদিনই ছিল না এবং জীবন-স্মৃতি যে একদিন লিখিতে হইবে তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। কিন্তু আমার বন্দী কথাটা আমার মনের মধ্যে পাখা ঝাপ্‌টাইয়া মরিতেছে, তাহাকে যদি বাহিরের বাতাসে আদৌ আসিতে না দিই তবে তাহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। তাই আমি লিখিতে বসিয়াছি।

আমার নাম আমি লিখিব না। আমি যেন নামগোত্রহীন, আমার নাম যেন সুকোমল।······আর তাহার নাম? তাহার নামও আমি লিখিতে পারিব না, কারণ হয়ত কেহ আমার এই জীবনস্মৃতি পড়িবেন,

হয়ত তিনি আমাদিগকে চিনিতে পারিবেন, যাহা আমি চাইনা। আমার এই স্মৃতির পাতায় সে নমিতা নামেই পরিচিত হইয়া থাকুক।

নমিতার সঙ্গে আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স পঁচিশ, নমিতার বয়স উনিশ। রঙীন্ স্বপ্নের আবেশে তাহার মন ছিল বিহ্বল, পুলকচঞ্চল, তাই আমাকে দেখিয়াই সে আমার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল আমাকে জীবন হইতে বাদ দিলে তাহার নারীত্ব রহিবে অসম্পূর্ণ, অবাস্তব। অত্যন্ত গভীরভাবেই সে অনুভব করিয়াছিল তাহার সৃষ্টি হইয়াছে শুধু আমারই জন্য।

আমারও নমিতাকে ভাল লাগিয়াছিল। এই ভাল-লাগা ভালবাসার পর্য্যায়ে হয়ত তখনও পৌঁছায় নাই, কিন্তু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, আমি বিশ্বাস করি ভালবাসার প্রথম স্তরে থাকে শুধু ভাল-লাগা, বিশেষ করিয়া পুরুষের দিক হইতে। কাজেই হৃদয়সম্পদে নিজেকে নমিতার চেয়ে বিশেষ খাটো মনে করিবার মত কোন কারণই আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

এইভাবে আমাদের বিবাহিত জীবন সুরু হইয়াছিল এবং প্রথম বৎসরটি আমাদের কাটিয়াছিল একটি রৌদ্রোজ্জ্বল শারদ প্রভাতের মত। এই একটি বৎসরের মধ্যে আমরা পরস্পরকে নিবিড় করিয়া পাইয়াছিলাম সমগ্রভাবে—দেহ এবং মন উভয়েরই সম্মিলিত মিলনের মধ্যে খুঁত ছিল না এতটুকু।

আমাদের এই সব-কিছু-ভোলা বিভোরতা হয়ত আরও অনেকদিন অব্যাহত থাকিত, কিন্তু হঠাৎ একটি সন্ধ্যার তুচ্ছ এক ঘটনায় নমিতা যেন মায়াস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল।

আমি কলেজে অধ্যাপনা করিতাম এবং ভাল অধ্যাপক বলিয়া আমার কিছু খ্যাতিও ছিল। পদার্থবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রেই আমার

ছিল ব্যুৎপত্তি। এই দুইটি বিষয় অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ক্ষেত্রে ছিল আমার অপ্রতিহত রাজত্ব, এখানে আমি কাহারও কোন অনধিকার প্রবেশ মোটেই সহ্য করিতে পারিতাম না। হয়ত ইহা আমার গোঁড়ামি, হয়ত ইহা আমার মনের ক্ষুদ্রতা, কিন্তু যাহা আমার স্বভাব তাহাকে অতিক্রম করিয়া ওঠার মত দৃঢ়তা এবং সৎসাহস আমার ছিল না।

আমার এই গোঁড়ামির আর একটা দিক আছে। আমার রাজ্যে যেমন আমি অপরের অনধিকার প্রবেশ সহ্য করিতে পারি না তেমনই অপরের রাজ্যেও আমি কোনপ্রকার অনধিকারচর্চ্চা করি না। আমার মতে প্রত্যেক নরনারীর চারিদিকে এমন একটা পরিমণ্ডল থাকা উচিত যেটা হইবে তাহার নিজস্ব, যেখানে সে বিচরণ করিতে পারিবে স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্যে।

আমার ধারণা ছিল প্রত্যেক মানুষই এইপ্রকার একটা স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা রীতিমত পছন্দ করে। মেয়েরা, বিশেষ করিয়া স্ত্রীসম্প্রদায় যে ইহার ব্যতিক্রম তাহা আমার জানা ছিল না। যদি জানা থাকিত তবে, হয়ত, যে প্রকাণ্ড ভুল করিয়া বসিয়াছি তাহা করিতাম না, নমিতাকে এত আকস্মিকভাবে হারাইতে হইত না।

যে কথা বলিতে সুরু করিয়াছিলাম তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হ্যাঁ, সেদিন সন্ধ্যায় বেশ খানিকটা ক্লান্ত হইয়াই বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। আমার পড়ার ঘরে ঢুকিয়াই দেখি, নমিতা উপুড় হইয়া আমার একটা বই খুলিয়া কি যেন দেখিতেছে। আমি যে ঘরে ঢুকিয়াছি তাহা সে লক্ষ্যই করে নাই।

বেশ খানিকটা বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে আমি বলিলাম, ও কি হচ্ছে?

আমার উপস্থিতি এবং প্রশ্নের আকস্মিকতায় নমিতা বোধ হয় একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া নিয়া সে বলিল, তোমার মোটা মোটা বইগুলো দেখছিলাম। যে কট্‌মটে ভাষা, কিছু যদি বোঝা যায়!

তাহার সপ্রতিভতায় আমি আরও অপ্রসন্ন হইয়া বলিলাম, যেসব জিনিষ বোঝনা তা' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো কেন, নমিতা? সব কিছুই যে তোমাকে জান্‌তে হবে এমন দিব্যি ত কেউ দেয়নি!

আমার স্বরের তিক্ততা লক্ষ্য করিয়া নমিতা ভীতভাবে আমার দিকে তাকাইল, যেন সে অমার্জ্জনীয় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে। অতি অনুতপ্তস্বরে সে বলিল, আমি জান্‌তাম না তোমার বই ঘাট্‌লে তুমি বিরক্ত হবে, আমায় ক্ষমা ক'রো।

তখনই যদি আমি নমিতাকে বুকে টানিয়া নিতাম, তাহাকে আদর করিয়া বলিতাম, না, আমি বিরক্ত হইনি মোটেই—হয়ত কলেজের ক্লান্তিতে মনটা ছিল বেসুরো এবং তাই আমি হয়ে পড়েছিলাম একটু আত্মবিস্মৃত, তাহা না হইলে সেদিনকার দ্বন্দ্বে সেখানেই যবনিকা পড়িত এবং আমরা আবার রূপান্তরিত হইতাম কপোত কপোতীতে। কিন্তু সাধারণ আমরা নিয়তিকে এড়াইয়া যাইব কোন্ দুঃসাহসে? তাই নিজের ত্রুটিস্বীকার ত আমি করিলামই না, বরং তাহার অব্যবহিত পরে এমন কতকগুলি ব্যবহার করিয়া বসিলাম যে নমিতার কোমল মন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

আমার রূঢ়তা একটুও গায়ে না মাখিয়া নমিতা নিজের হাতে নিয়া আসিল চায়ের ট্রে। বলিল, শীগ্‌গির ক'রে চা'টা খেয়ে নাও, আমি তোমাকে খুব মজার একটা জিনিষ দেখাচ্ছি।

আমি কোন জবাব দিলাম না। নিস্পৃহভাবে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া নিলাম।

নমিতা আমার গা' ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বলিল, জানো, আজ আমি ভারী সুন্দর একটা গান লিখেছি!

গান লেখা এবং গানে সুর দেওয়া নমিতার জীবনের একটা বড় বিলাস। বিলাস বলিলে বোধ হয় অবিচার করা হয়, কিন্তু আমার বস্তুতান্ত্রিকমন চিরদিন তাহা বিলাসই মনে করিয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, নমিতার এই প্রয়াসকে আমি কোনদিনই উদারভাবে দেখিতে পারি নাই, ইহার মধ্যে আমি দেখিয়াছি শুধু চঞ্চলতার অভিব্যক্তি, সংসারের সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া নিতে না পারার একটা নিদর্শন। তাই আজ নমিতা যখন উচ্ছ্বাসের সহিত তাহার নূতন গান রচনার কথা বলিল তখন বিনানুমতিতে আমার অধ্যাপনার বই ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য আমার মনে যে অপ্রসন্নতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সপ্তমে চড়িয়া দাঁড়াইল গভীর বিরাগে।

বলিলাম, তোমাকে কতদিন বলেছি, নমিতা, এসব ছাইপাঁশ লেখায় সময় নষ্ট ক'রোনা, তবু তুমি আমার উপদেশে কাণ দেওয়া সমীচীন মনে কর'নি!

আসলে কিন্তু আমি নমিতার গান রচনায় কখনও বাধা দেই নাই বা কখনও পরিষ্কারভাবে বলি নাই যে এসব আমি পছন্দ করি না। আমার অননুমোদন আমি এতদিন মনের মধ্যেই পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, যদিও আমার অজ্ঞাতে এ বিষয়ে নমিতার বিরুদ্ধে আমার অনেকগুলি অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল।

নমিতা একটু হাসিয়া জবাব দিল, কিন্তু আমার যে ভালো লাগে!

আমার স্থির মতামতের উত্তরে এই ছেলেমানুষী কারণ দর্শানো আমার কাছে অসহনীয় বলিয়া বোধ হইল। বেশ একটু ঝাঁজের সহিতই বলিলাম, তুমি যদি তোমার এই অভ্যাস না বদ্‌লাও নমিতা, তাহ'লে তোমার সঙ্গে একত্র থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠ্‌বে।

নমিতা অবাক্‌বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাইল। আমার মুখ দিয়া যে এমন কঠিন কথা বাহির হইতে পারে স্বপ্নেও সে কল্পনা করে নাই। তাহার কি মনে হইয়াছিল জানিনা, কিন্তু যে বিহ্বল দৃষ্টিতে সে আমার মুখের দিকে মিনিট দশেক তাকাইয়াছিল তাহা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

অন্যান্য রাত্রির মত সেদিন রাত্রিতে আমি যখন নমিতাকে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলাম, আমি অনুভব করিলাম আমরা যেন আগেকার প্রিয়-প্রিয়া নহি, আমরা যেন অভ্যাসের নিগড়ে বাঁধা গতানু-গতিক প্রেমপন্থী স্বামী-স্ত্রী মাত্র।

ইহার পর হইতেই আমাদের মধ্যে ব্যবধানের একটা প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। আমার চোখের সম্মুখে নগ্নভাবে প্রকটিত হইতে লাগিল নমিতার চপলতা ও চাঞ্চল্য। এতদিন তাহার ছেলেমানুষীকে আমি উদার চোখে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার উচ্ছলতার মধ্যে দেখিয়া-ছিলাম প্রাণের স্পন্দন, সজীবতার আকুল আহ্বান। তখন তাহা নিছক অস্থির-চিত্ততা বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। আমার বিরাগ দৈনন্দিন ছোটখাট ঘটনার মধ্যে নমিতাকে জানাইয়া দিতেও আমি ত্রুটি করিলাম না।

নমিতা আমার ব্যবহারে ব্যথা পাইয়াছিল নিশ্চয়ই, যদিও সে মুখ ফুটিয়া আমাকে কিছু বলে নাই। তাহার চরিত্রের মধ্যে ছিল এমন

একটা অনমনীয় দম্ভ যাহার সম্মুখে আমার সব কিছু বিরক্তিপ্রকাশ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ফল হইল এই যে মনে মনে আমি আরও অশান্ত, আরও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলাম।

আর একটা দিনের কথা আমার মনে পড়িতেছে। আমি দুইটা সিনেমার টিকিট কিনিয়া নিয়া আসিয়াছি, মার্লিন ডিয়েট্রিস্ এবং ক্লার্ক গেব্‌ল্‌এর ছবি। নমিতা বহুদিন সিনেমা দেখে নাই, আমি ভাবিয়াছিলাম আমার এই হঠাৎ টিকিট নিয়া আসায় সে খুব খুসী হইবে।

নমিতার কিন্তু কোন ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। আমার উৎসাহোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া সে শুধু বলিল, তোমার সিনেমা দেখ্‌তে খুব ইচ্ছে করছে বুঝি?

আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম, তা' কর্‌ছে বই কি! যদি ইচ্ছে না কর্‌ত তাহ'লে নিশ্চয়ই পয়সা খরচ করে টিকিট কিনে নিয়ে আস্‌তুম না!

—ওঃ! কিন্তু আমার ভালো লাগ্‌বে কি না একবার ভেবে দেখেছ কি?

মূহুর্ত্তের মধ্যে আমার স্মরণ হইল মার্লিন ডিয়েট্রিস্ এবং ক্লার্ক গেব্‌ল্ ইহাদের একজনকেও নমিতা পছন্দ করে না। এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীসম্বলিত একটা ছবি আমরা একবার দেখিতে গিয়াছিলাম বিবাহের অব্যবহিত পরে এবং ইণ্টারভ্যালের সময়ই আমরা উঠিয়া আসিয়াছিলাম, কারণ নমিতা বলিয়াছিল, পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছি বলেই যে বাজে ছবি দেখার শাস্তি ভোগ কর্‌তে হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই! ···আমি অবলীলাক্রমে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম এই নিতান্ত-অকিঞ্চিৎকর-নয় ঘটনাটি!

কিন্তু নমিতার শ্লেষ আমার ভাল লাগিল না। আমিও সমান ওজনে জবাব দিলাম, উচ্চশ্রেণীর অভিনয় যে গ্রাম্যমেয়েদের বুদ্ধি এবং রসবোধশক্তির অতীত ভুলেই গিয়েছিলাম। বুঝ্‌তে পারে এমন সঙ্গীর অভাব হবে না, তোমার আস্‌বার প্রয়োজন নেই। বলিয়া আমি একাই চলিয়া গেলাম সিনেমায়। কিন্তু কি-জানি-কেন সেদিন ডিয়েট্রিস্ এবং গেব্‌ল্‌এর ছবি আমার মনকেও স্পর্শ করিল না এবং ইণ্টারভ্যালের সময় আমি উঠিয়া আসিলাম।

উঠিয়া আসিলাম সত্য, কিন্তু আমার মনের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল এবং তাহার জন্য আমি দায়ী করিলাম নমিতাকে, তাহার উদারতার অভাবকে।

বলা বাহুল্য, নমিতার দিকটা আমি একেবারেই লক্ষ্য করি নাই। যদি করিতাম তবে বোধ হয় ফিরিবার একটা পথ থাকিত।

নমিতা বুঝিয়াছিল আমি তাহাকে আর ক্ষমার চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত নহি এবং তাই তাহার ছোটখাট দুর্ব্বলতাকে আমি অহেতুকভাবে বড় করিয়া দেখিতে স্বরু করিয়াছি। ফলে, সে নিজেকে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করিয়া নিয়া আসিয়াছিল তাহার নিজের জগতে, যেখানে তাহার অপ্রতিহত রাজত্ব। আমার অজ্ঞাতে, গৃহ হইতে আমার প্রাত্যহিক অনুপস্থিতির অবকাশে সে আরও উৎসাহের সহিত গা' ঢালিয়া দিল গানরচনায় এবং গানে স্বর দেওয়ায়।

নিঃশব্দে তাহার এই নিষিদ্ধ কাজ করা যে আমি সময় সময় অনুভব করি নাই এমন নয়, কিন্তু আমার বিরক্তি প্রকাশের পরও যদি সে স্বাধীন ইচ্ছায় এবং বুদ্ধিতে তাহার এই বিলাসে আত্মনিয়োগ করে তবে আমার কিছুই বলিবার নাই। তাহার পরিমণ্ডল নিয়া সে থাকুক

তাহার আনন্দে, আমি অনধিকার প্রবেশ করিব না মোটেই। ···কিন্তু আমিও চাই, আমার পরিমণ্ডলের ছায়া যেন সে ভুলেও না মাড়ায়।

স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার অহমিকায় আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে নারী স্বাতন্ত্র্য চায় না। সে চায় বন্ধুত্ব, সে অনুভব করিতে চায় যে তাহার প্রিয়ের অনুরাগ ঘিরিয়া আছে তাহার নিজের প্রত্যেকটি চপলতায়, বিলাসে, ছোটবড় কাজে অকাজে। ···নমিতাও চাহিয়াছিল যে আমি তাহার সব কিছু লীলাচাঞ্চল্য, তাহার প্রত্যেকটি অনুরাগ বিরাগকে দেখি ক্ষমাসুন্দর চোখে। কিন্তু তাহার অভিলাষ পূরণ করিতে আমি এতটুকু চেষ্টাও করিলাম না।

এইভাবে দিন চলিতে লাগিল। আমাদের মধ্যকার ব্যবধান ক্রমশঃ আরও বিশাল, আরও দুরতিক্রম্য হইয়া চলিল। বাহিরের আচরণ অটুট রহিল সত্য, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমরা উভয়েই অনুভব করিতে লাগিলাম আমাদের ভালবাসায় ঘুণ ধরিয়াছে। তবু আমরা অভিনয় করিয়া চলিলাম, কারণ অভিনয়ের সাহায্যে বাস্তবের নগ্নতা খানিকটা অন্ততঃ ঢাকা পড়ে।

ইহার মধ্যে নমিতার একবার অত্যন্ত শক্ত একটা অসুখ হইয়াছিল। রোগশয্যায় তাহার সস্নেহ পরিচর্য্যা করিতে আমি কোনই কার্পণ্য করি নাই, হয়ত বা চিরদিনের জন্য নমিতাকে হারাইবার সশঙ্ক সম্ভাবনাও আমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উদিত হইত। নমিতার রোগপাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানার দিকে তাকাইলে আমার পুঞ্জীভূত সব কিছু বিরক্তি দ্রবীভূত হইয়া আসিত। কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই নমিতা রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিল এবং আমরাও ফিরিয়া আসিলাম আমাদের আগেকার অভিনয়ের ভূমিকায়।

ইহার অব্যবহিত পরেই আমাদিগকে নৈনিতাল আসিতে হইল—ডাক্তারের পরামর্শে। ·নমিতার শরীর সম্পূর্ণভাবে সারিতে হইলে পাহাড়ের হাওয়ার দরকার এবং ডাক্তার বলিলেন নৈনিতালের পাহাড় ও লেক্ই হইবে সবচেয়ে উপকারী। তাই আমরা নৈনিতালে আসিলাম। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত লিপির দু'একটি পাতাও যদি তখন দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে হয়ত আমি নমিতাকে নিয়া যাইতাম মুসৌরী বা শিমলা বা দার্জ্জিলিঙএ— নৈনিতালে কিছুতেই নয়!

নৈনিতালে প্রথম সপ্তাহটা কাটিয়াছিল বেশ অনাবিল আনন্দে। সাময়িকভাবে আমরা যেন আমাদের লুপ্তপ্রায় প্রিয়প্রিয়াকে ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। লেকভিউ হোটেলের দোতলায় সবচেয়ে কোণের স্থইট্‌টা আমরা ভাড়া নিয়াছিলাম। আমাদের ঘরের সম্মুখের অনতিপ্রসর বারান্দায় বসিয়া আমরা দুইজনে তাকাইয়া থাকিতাম লেকের জলের দিকে আর লক্ষ্য করিতাম পথচারীচারিণীদের বিচিত্র বেশভূষা। অপরিণতবয়স্কা বালিকার মত নমিতা হাসিত আর তাহার হাসিতে আমিও সহজভাবে যোগ দিতাম।

প্রকৃতির আবরণের সাহায্যে ভিতরের ভাঙন প্রতিহত করা সাময়িকভাবে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু অনির্ব্বাণ অভিযোগের আঁচড়ে যে ভালবাসা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রহিয়াছে তাহা এইপ্রকার বাহ্যিক প্রলেপে কখনও স্বাভাবিক সুস্থতায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। তাই প্রথম সপ্তাহের নূতনত্ব কাটাইয়া উঠিবার পর আমরা বুঝিতে পারিলাম সংসারের দৈনন্দিন দুর্ব্বলতা ও কার্পণ্যবর্জ্জিত আমাদের আনন্দবিহ্বল পুরানো দিনগুলি চিরকালের জন্য আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

ডালি

নৈনিতালের লেক্ এবং পাহাড়ে বোধ হয় মাদকতা আছে। তাই হারানো স্বাস্থ্য খানিকটা ফিরিয়া পাইয়াই নমিতা আবার তাহার বিলাস, গানরচনা এবং সঙ্গীতে মন দিল। এইসব তুচ্ছ কল্পনা-ছড়ানো কাজে সে বোধ হয় অদ্ভুত একটা প্রেরণা পাইত। কারণ আমি লক্ষ্য করিলাম দৈনন্দিন আহারবিহারে তাহার সময়ানুবর্ত্তিতাও যেন অনেকখানি চলিয়া গেল।

আমার মনে পড়িতেছে একদিন আমি পোযাক পরিয়া হোটেলের লন্‌এ পাইচারি করিতেছি, নমিতাকে নিয়া যাইব বেড়াইতে, নৈনিতাল হইতে মাইল কুড়িএকুশ দূরে ভাওয়ালী নামে ছোট এক সহরে। ট্যাক্সিষ্ট্যাণ্ড্এ ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছে। আমি পুনঃ পুনঃ আমার হাতঘড়িটার দিকে তাকাইতেছি। আধঘণ্টা হইয়া গেল, তবু নমিতার দেখা নাই। অধীর হইয়া আমি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেলাম আমাদের ঘরে। দেখি অর্দ্ধসজ্জিতা নমিতা টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া একাগ্রচিত্তে কি লিখিতেছে।

আমার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়া সে মুখ তুলিয়া তাকাইল। শুধু একটু হাসিল।

আমি বুঝিলাম সে তাহার প্রিয় বিলাসে নিমগ্ন।

বলিলাম, এদিকে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে, নমিতা, আর তুমি এখন ছাইপাঁশ লিখতে বসেছ ?

—ছাইপাঁশ না গো, নৈনিতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্মরণ করে কয়েক লাইন লিখ্‌ছি! ······বেশ একটু আবদারের সুরেই নমিতা বলিল।

—তাহ'লে তুমি ভাওয়ালীতে যাবে না ?

—আজ না হয় না-ই গেলাম। ভাওয়ালী ত ফুরিয়ে যাচ্ছেনা, ফুরিয়ে যাচ্ছে আমার প্রাণের স্পন্দন, আমার রসের উৎস।

আমি রীতিমত রাগিয়া উঠিলাম।

—আমার কষ্টোপার্জ্জিত পয়সা এইভাবে নষ্ট ক'রে তোমার স্বার্থপরতার পরিচয় না দিলেই আমি খুসী হ'তাম, নমিতা! একটু আগেও যদি বল্‌তে তোমার যাবার ইচ্ছে নেই তাহ'লে আমি শুধু শুধু ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়ার পয়সা দিয়ে আস্‌তাম না।

—ওঃ, তুমি এরই মধ্যে ট্যাক্সিভাড়া ক'রে বসে আছে? তাহ'লে আমি এখ্‌খুনি আস্‌ছি। আর দু'মিনিটমাত্র, তার বেশী দেরী হবেনা।

—দরকার নেই। তুমি তোমার কবিতা নিয়ে থাকো। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে আমার দণ্ড দিয়ে আসি। বলিয়া আমি রাগে গজগজ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলাম। যাইতে যাইতে অনুভব করিলাম, নমিতা একটু হাসিয়া আবার তাহার লেখায় মন দিল।

আমাদের স্যুইট্‌এর পাশের স্যুইট্‌টা অনেকদিন খালি ছিল। একদিন লক্ষ্য করিলাম সেখানে একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ভদ্রলোকের বেশভূষা একটু অসাধারণ; অধিকাংশ সময়ই তিনি গেরুয়া রংএর একটা আলখাল্লা পরিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার বাব্‌রী চুল অর্দ্ধেকটা ঢাকিয়া তাঁহার মাথার উপর বিরাজ করিত আধাগান্ধী ও আধারাবীন্দ্রিক একটা টুপী। তাঁহার বিচিত্র বেশভূষা দেখিয়া আমি তাঁহাকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে স্নরু করিয়াছিলাম।

লেকের ধারে একদিন ভদ্রলোকের একেবারে সাম্‌নাসাম্‌নি পড়িয়া গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি একটু হাসিলেন এবং নমস্কারের

ভঙ্গীতে মাথাটা একটু হেলাইলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকেও একটু থম্‌কাইয়া দাঁড়াইতে হইল।

ভদ্রলোকই প্রথমে কথা বলিলেন।

—অনেকদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌ব ভাব্‌ছি, হোটেলে পাশাপাশি কামরায় রয়েছি, কিন্তু কোন না কোন কারণে আলাপটা হয়ে ওঠেনি'।

মুখে হাসি টানিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, আপনাকেও আমি দূর থেকে ক'দিন ধরে দেখ্‌ছি।...আপনি ত দিন তিনচার হ'ল এসেছেন, না?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার এর মধ্যেই আলাপ হয়ে গেছে...অত্যন্ত অসাধারণ মেয়ে, সচরাচর এরকম প্রতিভা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য আমি বিস্ময়াপ্লুত হইয়া উঠিলাম। নমিতা ত তাহার এই নূতন পরিচিতের কথা আমাকে বলে নাই!

ভদ্রলোক বলিয়া চলিলেন, প্রথম আলাপেই আপনার স্ত্রীর কথা বল্‌ছি ব'লে কিছু মনে কর্‌বেন না যেন। হাজার হোক্, বয়সে প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছেছি, মেয়েরা আমাদের কাছে নিজেদের যেরকম অসঙ্কোচে প্রকাশ ক'রে ফেলে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের লোকদের কাছে সেরকম কখনও কর্‌তে পারেনা।...আপনি কি মনে করেন না...

বলিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাইলেন।

—সুকোমল। আমার নাম সুকোমল দত্ত।

—আমার পরিচয়ও দিই, আমার নাম পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।...হ্যাঁ, আপনি কি মনে করেন না সুকোমলবাবু, আপনার স্ত্রীর প্রতিভা সত্যিই অসাধারণ? এই বয়সে উনি যে গান রচনা করেছেন এবং তাতে সুর

দিয়েছেন তা' দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। গান জিনিষটা আমি একটু আধটু বুঝি, তাই বল্‌ছি, আপনি ওঁর এই ক্ষমতাটা কিছুতেই নষ্ট হ'তে দেবেন্ না। এর পূর্ণ বিকাশ হ'লে আমাদের দেশ গর্ব্ব কর্‌বার মত কিছু জিনিষ পাবে!

এক নিঃশ্বাসে পবিত্রবাবু কথাগুলি বলিয়া গেলেন।

আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, পবিত্রবাবুর এই গায়ে-পড়া উপদেশ দানে আমি মোটেই প্রীত হইতে পারি নাই।

—আপনার সঙ্গে অন্য এক সময় কথা বল্‌ব। ...বলিয়া শশব্যস্তে আমার গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাইবার ভাণ করিয়া আমি বিদায় নিলাম।

পবিত্রবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিষয় নমিতাকে আমি কিছুই বলিলাম না। আমার মনের রুদ্ধ অন্তঃপুরে নমিতার বিরুদ্ধে তীব্র অভিমান গুমরাইয়া গুমরাইয়া মরিতে লাগিল। নমিতা আজকাল আমাকে এতখানি পর ভাবে যে পবিত্রবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের কথাটা পর্য্যন্ত আমাকে জানানো সঙ্গত মনে করে নাই? অথবা সে কি ভাবে আমি তাহার উচ্চকৃষ্টিগত কাজগুলির রসগ্রহণ করার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত? পবিত্রবাবুর মত আমি তাহার অন্ধ স্তাবক না হইতে পারি, কিন্তু সত্যিকারের প্রতিভার সম্যক্ মর্য্যাদা দিতে কি আমি জানিনা?

ঈর্ষ্যার যবনিকা আমাকে এতখানি মোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল যে সুবিধাবাদী আমি অবলীলাক্রমে ভুলিয়া গেলাম, নমিতা তাহার নিজের শক্তিগুলি কোনদিনই আমার নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখিতে চাহে নাই, বরং আমারই অবজ্ঞা, আমারই কৃপণতা তাহাকে বাধা দিয়াছে তাহার নিজেকে আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে। আজ যদি

সে আমাকে বাদ দিয়া সহানুভূতিসম্পন্ন রসজ্ঞ পবিত্রবাবুর কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াই থাকে তবে তাহার জন্য প্রধানতঃ আমিই কি দায়ী নহি ?

পরদিন চা খাইতে খাইতে আমি নমিতাকে বলিলাম, জানো, শান্তিনিকেতন থেকে রবিবাবুর একদল ছাত্রছাত্রী নৈনিতাল আস্‌ছেন, এখানে দু'তিনদিন অভিনয় নাচগান হবে।

—জানি।

নূতন একটা খবর দিতেছি, নমিতা উৎসুক এবং উৎফুল্ল হইবে ভাবিয়াছিলাম, তাহার শান্ত জবাবে আমি দমিয়া গেলাম।

তবু প্রশ্ন করিলাম, বুকিং এখন থেকেই সুরু হয়েছে, এক সন্ধ্যার জন্য দুটো সীট্ বুক্ করে এলে হয় না ?

ঠোঁটের কোণে একটা বক্র হাসি টানিয়া আনিয়া নমিতা বলিল, তুমি যাবে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের অভিনয় দেখ্‌তে ? ঘুম পাবেনা ?

মুহূর্ত্তের জন্য আমি নিজের স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলাম। তীব্রকণ্ঠে বলিলাম, আমার অন্যায় হয়েছে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছি ! পবিত্রবাবুর সঙ্গে যেতে পার্‌লে তুমি বোধ হয় বেশী খুসী হবে, না ?

নমিতা হাঁ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আমি সমান ওজনে বলিয়া চলিলাম, আমি এসব উচ্চাঙ্গের কৃষ্টি কিছুই বুঝিনা, রসজ্ঞ পবিত্রবাবু তোমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।...তা আমি নিতান্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ নই, দুটো টিকিট আমিই না হয় কিনে দিচ্ছি, তোমরা দু'জনে দেখে এসো।

এবার নমিতা কথা বলিল।

—তুমি কী যা' তা' বল্‌ছ? স্বল্পপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এসব কদর্য্য ইঙ্গিত কর্‌তে তোমার একটুও লজ্জা হয় না?

নমিতা বোধ হয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, স্বল্পপরিচিত নিশ্চয়ই, তবু যদি তোমরা এরকম লুকোচুরি না কর্‌তে!

—লুকোচুরি? লুকোচুরি কোথায় কর্‌লাম? ···বিস্মিতস্বরে নমিতা প্রশ্ন করিল।

—লুকোচুরি নয়? পবিত্রবাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে আজ বোধ হয় হপ্তাখানেক হ'ল, তিনি তোমার প্রতিভা সম্বন্ধে শতমুখ হয়ে সারা নৈনিতালে তোমার জয়গান ক'রে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী, আমাকে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দিয়েছ তাঁর সঙ্গে তোমার গভীর পরিচয়ের কথা?

আমার স্বরের নিবিড়তাকে হাল্কা করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়া নমিতা বলিল, ওঃ, এই? ···তবে তোমায় বলি, পবিত্রবাবুর সঙ্গে প্রথম এবং শেষ আলাপ হয়েছে কাল দুপুরে, যখন তুমি গিয়েছিলে তোমার প্রোফেসারবন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে। তারপর শান্তভাবে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌বার সুযোগ পেলাম কই? সন্ধ্যের সময় যখন তুমি হোটেলে ফির্‌লে তখন দেখ্‌লাম তোমার মুখখানা অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা, আমার সঙ্গে নিছক ভদ্রতাসূচক দু'একটা 'হ্যাঁ', 'না' ছাড়া একটি কথাও বল্‌লে না তুমি! তারপর আজ সকালবেলা চা' খেয়েই তুমি বেরিয়ে গেলে তোমার বন্ধুর কাছে···ফিরে এলে একটু আগে! আমি ভেবেছিলাম এখন তোমার কাছে পবিত্রবাবুর কথা বল্‌ব, কিন্তু তুমিই হঠাৎ ভদ্রলোককে জড়িয়ে কতকগুলো বিশ্রী ইঙ্গিত ক'রে বস্‌লে! ছিঃ···

অবিশ্বাসের স্বরে আমি বলিলাম, একদিনের আলাপেই পবিত্রবাবু তোমার প্রশংসায় উচ্ছল হয়ে উঠ্‌লেন? তোমার মোহিনীশক্তি আছে, নমিতা!

—তুমি যদি আমায় বিশ্বাস না ক'রো তাহ'লে আমি হাজার জবাবদিহি ক'রেও তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারব না। আমার শেষ কথা এই, লুকোচুরি করা আমার স্বভাব নয়। যেদিন আমি বুঝ্‌ব তোমার গৃহে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে আমি নিজেই তোমাকে বল্‌ব, সে সৎসাহসটুকু আমার আছে।

বলিয়া নমিতা দৃপ্তভঙ্গীতে টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নমিতার কথায় আমি তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। অশান্তচিত্ত নিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম আমার বৈকালিক ভ্রমণে। অসংখ্য অভিযোগ মাথা উঁচাইয়া আমার মনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। প্রতিদিনের কাজকর্ম্ম, ভয়ভাবনা, কৃপণতা বিশ্লেষণ করিয়া আমি শুধু দেখিতে পাইলাম নমিতা আমার প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছে, আমাকে নির্ম্মমভাবে ঠকাইয়াছে। অভিমানের, ঈর্ষ্যাব স্তবকে স্তবকে আমার বুক ভরিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার একটু পরে আমি হোটেলে ফিরিলাম। ঘরে ঢুকিতে যাইব এমন সময় কাণে আসিল একজন পুরুষমানুষের কথাবলার শব্দ এবং একটি মেয়ের চাপা কান্নার স্বর।

আমি থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলাম।

শুনিলাম, পবিত্রবাবু বলিতেছেন, তুমি শান্ত হও, নমিতা, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের এত অধীর হ'লে কি চলে?

উত্তরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নমিতা কি বলিল আমি শুনিতে পাইলাম না।

পবিত্রবাবু আবার বলিলেন, তোমার স্বামী এখ্‌খুনি এসে পড়বেন, তুমি মুখহাত ধুয়ে সুস্থ হয়ে ব'সো, নইলে তিনি কি ভাব্‌বেন বল ত ?

রাগে আমার গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। নমিতার প্রতারণা যে এতদূর গড়াইয়াছে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই।

—আমি তাহ'লে এখন আসি, কেমন ?

বলিয়া পবিত্রবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। আমাকে বারান্দায় দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পলকের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া নিয়া বলিলেন, এই যে সুকোমলবাবু, আজ আপনাদের কি হয়েছে বলুন ত ? আমি এসেছিলাম আপনার স্ত্রীর দু'একটা রচনা শুন্‌তে, কিন্তু তিনি হঠাৎ কেন যে এতখানি বিহ্বল হয়ে উঠ্‌লেন বুঝতে পার্‌লাম না। ...তা' আপনি এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে...

পবিত্রবাবু হয়ত আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, আমি তাঁহাকে অবসর না দিয়া সোজা ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া নমিতা অশ্রুকলঙ্কিত মুখ তুলিয়া বসিল।

বলিল, দেখো, তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলা নিতান্ত দরকার।

তীব্র শ্লেষমিশ্রিতকণ্ঠে আমি জবাব দিলাম, না বল্‌লেও চল্‌বে, আমার চোখকাণ দুইই আছে, আর বুদ্ধিশক্তিও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, কিছু কিছু বুঝ্‌তে পারি।

—পবিত্রবাবুর সঙ্গে এখন তোমার দেখা হয়েছে ?

—অসময়ে এসে রসভঙ্গ করেছি, তাই দেখা হয়ে গেল, নইলে হয়ত আজকের লীলাও আমার অজ্ঞাতেই থেকে যেত !

অনুনয়মিশ্রিতস্বরে নমিতা বলিল, তুমি বারবার ভয়ানক ভুল করছ। তোমার ভুলটা আমি ভেঙ্গে দিতে চাই, আর আমার এই কান্নার কারণটা কি তা'ও বল্‌তে চাই।

উদ্ধতভাবে আমি জবাব দিলাম, কোন প্রয়োজন নেই···তুমি শুধু আমাকে জানিয়ে দিয়ো আমি কিভাবে চল্‌লে তোমার সুখশান্তি অব্যাহত থাক্‌বে, আমি নিজেকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

নমিতা ইহার উত্তরে কিছু বলিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, এখ্‌খুনি বল্‌বার দরকার নেই, ভেবেচিন্তে কাল ব'লো, আমি তোমার ইচ্ছা পালন কর্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব।

নমিতার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা, এই আমার শেষ সম্ভাষণ। এখন ভাবিতেছি, কেন আমি শান্তভাবে নমিতার কথাগুলি শুনিতে স্বীকৃত হই নাই, কেন আমি ভুলের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিলাম। নমিতা, আমার নমিতা, অতি অভিমানিনী, এই বড় কথাটা কেন আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম? তাহার অনির্ব্বাণ বেদনার এতটুকু অংশ যদি আমি নিতে প্রস্তুত হইতাম তবে আজ তাহাকে বোধ হয় হারাইতাম না! আমি যে নমিতাকে ভালবাসি, অতি নিবিড়ভাবে ভালবাসি, এই বড় সত্যটা কেন আমি জোর গলায় নমিতার সম্মুখে বলিলাম না?

আজ ভোরবেলা একপেয়ালা চা' খাইয়াই আমি বাহির হইয়া গিয়াছিলাম। নমিতা আমার আগেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। চা' খাইতে খাইতে আমি শুধু শুনিয়াছিলাম তাহার হাতের চুড়ির নিক্কন, বেশপরিবর্ত্তনের শব্দ।

যখন ফিরিলাম তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। অভ্যাসমত আমি নমিতার খোঁজ করিতে গেলাম আমাদের শোবার ঘরে কিন্তু সেখানে

তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম হয়ত সে কোথাও বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি বসিবার ঘরে চলিয়া আসিলাম।

ঘরে ঢুকিবার সময় পাশের টেবিলটা লক্ষ্য করি নাই। এখন সেইদিকে নজর পড়িল। দেখি একখানা চিঠি সেইখানে পড়িয়া আছে।

কৌতূহলী হইয়া চিঠিখানা তুলিয়া নিলাম। উপরে আমার নাম, নমিতার হাতে লেখা।

চিঠিটা আমি পড়িয়াছি, একবার নয়, দুইবার নয়, অন্ততঃপক্ষে একশ বার। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না আমার অভিমানিনী নমিতা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার উপর এতবড় ভুলের বোঝা চাপাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল? সে ত আমাকে বলিয়াছিল যখন তাহার মনে হইবে আমার গৃহে বাস করা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে তখন সে খোলাখুলিভাবে আমাকে বলিবে! কেন সে বলিল না! কেন সে আমাকে এতটুকু সুযোগ দিল না যাহাতে আমি তাহাকে বলিতে পারি, আমার ভুল হইয়াছে, আমি তাহাকে অবিশ্বাস করি নাই। অন্তরে অন্তরে আমি তাহাকে যতখানি শ্রদ্ধা ও স্নেহ করি আর কোন নারীকেই আমি সেরূপ শ্রদ্ধা স্নেহ করি নাই, করিতে পারিব না।

নমিতা লিখিয়াছে, আমাদের দু'জনের একত্রে থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, তাই কিছুদিনের ব্যবধান দরকার, যদি এই ব্যবধানের অবসরে আমরা পরস্পরকে খুঁজিয়া নিতে পারি! কিন্তু এই শাস্তির ত কোন প্রয়োজন ছিল না! ...রাণীখেট্! কোথায় এই রাণীখেট্? ইহার সন্ধান নমিতা কি করিয়া পাইল? আমার গৃহের নীড় ছাড়িয়া সে কি শান্তি পাইবে রাণীখেট্এর একাডেমিতে?

নমিতা বলিয়াছে আমি যেন তাহার খোঁজ না করি, তাহার সন্ধানে আমি রাণীখেট্‌এ না যাই, কারণ আমার উপস্থিতি তাহার বেদনাবিহ্বল মনকে আরও অশান্ত করিয়া তুলিবে। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া আমি কি করিয়া এই নৈনিতালে থাকিব? দিনের পর দিন পাহাড়ের শ্রেণীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আমার চোখ যে ক্লান্ত হইয়া আসিবে, আমার মন যে চঞ্চল হইয়া উড়িয়া যাইতে চাহিবে এইসব শৈলশ্রেণীকে অতিক্রম করিয়া নমিতা যেখানে আছে সেইখানে!

পাশের স্থইট্‌এ পবিত্রবাবুর গলা শুনিতে পাইতেছি। তিনি জানেন না নমিতা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি অন্যায়ভাবে তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছি! কিন্তু আমি আমার এই দীনতা, এই অসহায়তা কিছুতেই তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে পারিব না!

নমিতাকে আমি ফিরাইয়া আনিব, রাণীখেট্‌এ সে পৌঁছাইবার আগেই আমি তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইব। তাহাকে বলিব, নমিতা, আমার ভুল হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ফিরে চলো।

নমিতা নিশ্চয়ই আমার অনুরোধ শুনিবে। যখন সে দেখিবে ক্ষতবিক্ষত পদে আমি ছুটিয়া আসিয়াছি শুধু তাহাকে ফিরাইয়া নিয়া যাইতে তখন তাহার সব কিছু অভিমান অভিযোগ নিশ্চয়ই দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।

হ্যাঁ, এই ঠিক। নমিতা গিয়াছে রাণীখেট্‌এ সাধারণের পথ বাহিয়া। আমি যাইব উত্তুঙ্গ পাহাড়গুলি অতিক্রম করিয়া, অনধিগম্য অথচ সংক্ষিপ্ত পথের পথিকরূপে। আমি এখনই যাত্রা করিব, কিন্তু তাহার আগে আমার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গেলাম, কারণ আমি ফিরিয়া না আসিলেও নমিতা যদি ফিরিয়া আসে তবে সে জানিবে

যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি

আমি তাহারই সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহারই ক্ষমা ভিক্ষা করিতে !

:
.

মন্ত্রমুগ্ধের মত অরিন্দম এই বিচিত্র কাহিনী পড়িতেছিল। শেষ পৃষ্ঠায় আসিয়া সে ঘড়িটার দিকে তাকাইল, উঃ, বারোটা বাজিয়া গিয়াছে !

তাহার দৃষ্টি পড়িল খাতার ভাঁজে সযত্নে রাখা চিঠিটার দিকে। পরিষ্কার মেয়েলি হাতে লেখা—

"শ্রীচরণেষু,

ভেবেছিলাম মুখেই তোমাকে আমার কথাগুলো বল্‌ব, একদিন অহঙ্কার ক'রে বলেওছিলাম, যখন তোমার গৃহে বাস করা আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠ্‌বে তখন তা' বল্‌বার সৎসাহসের অভাব আমার হবে না, কিন্তু ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে চিঠির আশ্রয় নিতে হ'ল, আমার এই দুর্ব্বলতাটুকু তুমি ক্ষমা ক'রো। তোমার অবিশ্বাস, তোমার শ্লেষের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার ভয় করেনা, কিন্তু সঙ্কোচ হয়। এই সঙ্কোচকে কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

পবিত্রবাবু এবং আমার মধ্যে কোনই বিশেষ সম্বন্ধ নেই। তাঁকে জেনেছি মাত্র দু'দিন এবং হয়ত তাঁকে ভুলেও যাব দু'দিন পরে। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দিনের আলাপ হয় তোমার অনুপস্থিতিতে, কিন্তু ভদ্রলোকের কোনই অসাধু উদ্দেশ্য ছিল না এবং নেই তা' তোমাকে শপথ ক'রে বল্‌ছি। তিনি একটু কবিপ্রকৃতির লোক, নিজেও এককালে কবিতা লিখ্‌তেন, কথায় কথায় তাঁর কাছে আমি বলে ফেলেছিলাম আমার গানরচনার কথা। শুনে তিনি এতখানি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি আমাকে প্রায় বাধ্য করেছিলেন আমার

দু'একটা রচনা তাঁকে দেখাতে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমি এড়াতে পারিনি'। তা'ছাড়া তাঁর প্রশংসা আমাকে হয়ত একটুখানি অপ্রকৃতিস্থও করে ফেলেছিল, কারণ তুমি জানো, প্রশংসা দূরে থাক্, এতটুকু উৎসাহও আমি কখনও তোমার কাছ থেকে পাইনি'।

তারপর পবিত্রবাবুকে নিয়ে কাল তোমার সঙ্গে আমার কথা কাটা-কাটি হ'ল, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। তুমি রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলে, আর আমি হতচেতন, মুমূর্ষুর মত বসে রইলাম। এমন সময় এলেন পবিত্রবাবু, তোমারই খোঁজে। আমাকে দেখে তিনি সোৎসাহে সুরু করলেন তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা, বললেন তুমি কতখানি গৌরব বোধ কর তোমার স্ত্রীর প্রতিভাসম্পর্কে। ···কথাটা অতি সাধারণ, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা উপহাসের খোঁচা অনুভব করলাম যে আমি অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। পবিত্রবাবু রীতিমত অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, অত্যন্ত স্নেহের স্বরে বললেন, আমি তাঁর মেয়ের মত, যদি আমার কোন আপত্তি না থাকে তাহ'লে আমার অশ্রুর কারণ তাঁকে খুলে বলতে পারি। ···কি আমি বলব? আমি কিছুই বলতে পারিনি'। পবিত্রবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সান্ত্বনাসূচক দু'একটা কথা বলে বেরিয়ে চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলে তুমি। তোমার কথায় বুঝলাম পবিত্রবাবুর আমার কাছে আসাটা দেখেছ, কিন্তু বুঝিয়ে বলবার এতটুকু সুযোগ তুমি দিলে না! তুমি শুধু বললে, কোন প্রয়োজন নেই!

তুমি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছ, যার স্মৃতি আমি চিরকাল আঁকড়ে ধরে থাকব, সযত্নে, সগর্ব্বে। কিন্তু একটা অভাব তুমি পূরণ করতে চেষ্টা করোনি' কোনদিন। কোথায় যেন পড়েছি, নারী কাদায়

যদি ক্রুত তুমি না যেতে চমকি

তৈরী খেলার পুতুল নয়, আবার সুরে তৈরী বীণার ঝঙ্কারমাত্রও নয়। ...তুমি আমাকে চিরদিন চেয়েছ তোমারই আসক্তি-অনাসক্তির প্রতিচ্ছবি প্রিয়ারূপে এবং আমার কাছে এসেছ দয়িতের বেশে। বন্ধুর মূর্ত্তিতে তুমি কখনও আসনি' এবং আমাকে তোমার বন্ধু ব'লে স্বীকারও করোনি'। তুমি জানো, গতানুগতিকভাবে আমাদের বিয়ে হয়নি', আমরা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম, কাজেই আমি যখন দেখ্‌লাম আমাদের জীবনেও সাধারণ দম্পতির পরস্পরের সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম হ'ল না তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'লাম।

আমার এই ক্ষোভ তুমি দূর করে দিতে পার্‌তে অনায়াসে, কিন্তু তুমি সে প্রয়াস ত কর্‌লেই না, বরং তোমার মনে এসে আশ্রয় বাঁধ্‌ল অবিশ্বাস, ঈর্ষ্যা আর অহেতুক অভিমান। আমি এতদিন যেন স্বপ্নে চলেছিলাম, আমার পরিমণ্ডলের খোলাবাতাসে বাধা পাইনি', তোমার এই অবিশ্বাস, ঈর্ষ্যা, অভিমানের ভিড়ে ধাক্কা পেলাম। হাজার কথার আবর্জ্জনা, হাজার বেদনার স্তূপ থেকে অতি খাঁটি একটি সত্য প্রতিভাত হয়ে এল, তুমি আমাকে কোনদিন যথার্থভাবে ভালবাসনি'।

আমি আর সব সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাসনি' এই নগ্ন সত্যটা কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনা। হয়ত আমার ভুল, হয়ত আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বর্ণান্ধ হয়ে এসেছে, কিন্তু আমি অনুভব কর্‌ছি আমাদের পুরানো সাধারণ সহজ দিনগুলো ফিরিয়ে আন্‌তে হ'লে বেশ কিছুদিনের ব্যবধানের দরকার, ব্যবধানের অবসরে যদি আমরা পরস্পরকে খুঁজে পাই।

আমি চল্‌লাম রাণীখেট্‌এ, সেখানকার একাডেমি অব্‌ মিউজিক্‌এ। আমার যে বিলাস তোমাকে প্রতিনিয়ত ক্লিষ্ট করে তুলেছে তা' আমি

বর্জ্জন করুতে পারুছিনা, কারণ তা' আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে উদ্বুদ্ধ। যদি তুমি এই ব্যবধানের অবসরে আমার এই বিলাসকে ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে পারো, যদি ভবিষ্যতে তুমি মনে ক'রো এই বিলাসলিপ্ত আমাকে দিয়ে তোমার কোন প্রয়োজন আছে, তাহ'লে আমাকে জানিয়ো, আমি তোমার গৃহে ফিরে আস্‌ব। কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তুমি এখনই আমার খোঁজ করুতে সুরু ক'রোনা, কারণ আমাদের যে বিরোধ তার সামঞ্জস্য দু'একদিনে হবেনা।

শেষ কথা এই, পবিত্রবাবু আমার এই রাণীখেট্‌এ যাত্রার কথা কিছুই জানেন না, তাঁকে তুমি এর জন্য অপরাধী ক'রোনা। রাণীখেট্‌এর খবর পেয়েছি আমি সংবাদপত্রের অনুগ্রহে এবং সেখানে আমার পরিচিত একজন মেয়ে বন্ধু আছে। সেখানে আমার বিশেষ কোন কষ্ট হবেনা।

—তোমার স্ত্রী।"

অরিন্দম আবার তাহার হাতঘড়িটার দিকে তাকাইল। সাড়ে বারোটা।

যে অনুনয়ের স্বরে মোহিত হইয়া সে ড্রয়ারটি খুলিয়াছিল তাহা আর শোনা যাইতেছিল না, যেন সুকোমলের আত্মা অবশেষে মুক্তি পাইয়া বাহিরের বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে।

বাতিটা নিভাইয়া দিয়া অরিন্দম পুনরায় শুইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় প্রকাণ্ড একটা দমকা হাওয়ার ঝাপ্‌টায় তাহার ঘরের জানালাটা খুলিয়া গেল এবং ঝন্‌ঝন্ করিয়া কয়েকটা কাঁচ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অরিন্দমের মনে হইল একটা পুরুষের ছায়া যেন দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের দিকে উড়িয়া গেল।

নিজেরই অজ্ঞাতে অরিন্দম চীৎকার করিয়া উঠিল।

অরিন্দমের চীৎকার ম্যানেজারবাবু শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি শশব্যস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, ওকি, অরিন্দমবাবু, ভয় পেয়েছেন নাকি ?

ততক্ষণে অরিন্দম নিজেকে সাম্‌লাইয়া নিয়াছে। সে মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, না, তবে আপনাদের সেই বাঙালীবাবুর নিজেহাতে লেখা কাহিনী পড়ছিলাম, এবং শেষ দিকটায় বেশ একটু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম! বলিয়া অরিন্দম তাহার সম্মুখের কাগজের তাড়ার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

—সে কি ? এ আপনি কোথায় পেলেন ?

—পেলাম ঐ ড্রয়ারে। ...আচ্ছা, আপনারা কেউ খোঁজ করে দেখেননি' এইসব ড্রয়ার আলমারী ? তাহ'লে এতদিনে সব রহস্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে যেত!

—না, এই সুইট্‌টা ব্যবহার হয় ক্বচিৎকদাচিৎ, তাই এদিকে কোন চাকরই নজর দেয় না! কিন্তু আপনি হঠাৎ এর সন্ধান পেলেন কি ক'রে ?

—অশরীরী আত্মার নির্দ্দেশ। ...অরিন্দম হাসিয়া বলিল।

—আমার কিন্তু মনে হয়, অরিন্দমবাবু, আপনার একা এই ঘরে রাত কাটানো সঙ্গত হবে না। হাজার হোক্, ম্যানেজার হিসেবে আমার খানিকটা দায়িত্ব আছে, আমি বল্‌ছি আজ রাতের মত আপনি আমার কোয়ার্টারে এসে শুয়ে থাকুন, কাল আর একটা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দেব।

অরিন্দম তাহার সুইট্ পরিত্যাগ করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু ম্যানেজারের পীড়াপীড়িতে সে রাজী হইল।

বিছানার আশ্রয় নিবার পূর্ব্বে অরিন্দম ম্যানেজারকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, বলুন ত, সেই ভদ্রলোক যেদিন পাহাড়ের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন সেদিন বা তার দু'একদিনের মধ্যে কোন ল্যাণ্ডস্লাইড্ হয়েছিল কি ?

ম্যানেজারবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে, ভদ্রলোক যেদিন নিরুদ্দেশ হন তার পরদিনই এই একটু দূরে খুব বড় একটা স্লিপ্ হয়েছিল। তারপর থেকেই লাল অক্ষরে খোদাই করা সতর্কবাণী পাথরের ফলকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ...আপনি দেখেন্নি ?

—হ্যাঁ, দেখেছি। তাহ'লে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ঐ পথেই গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

এই বলিয়া সে সংক্ষেপে ইংরাজীতে কাহিনীটি ম্যানেজারকে বলিল।

পরের দিন অরিন্দম অনীতাকে চিঠি লিখিয়া জানাইল, সাতনম্বর স্থইট্এর অশরীরী আত্মা মুক্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু নৈনিতালে তাহার আর মোটেই ভাল লাগিতেছে না। ...ভাল না লাগার কারণ সে লিখিল যে লেকভিউ হোটেলে আসিয়া তাহার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা সে যতশীঘ্র সম্ভব অনীতাকে জানাইতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

"দুঃখ হয়—যাহাকে ভালোবাসিতাম, অন্তরের গোপন ছায়ায় যাহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া লোকচক্ষু হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে চাহিতাম, সুখে ও দুঃখে নিরালায় বসিয়া মনটাকে যাহার কাছে অজস্র-বার মেলিয়া ধরিয়াছি, আজ তাহাকেই কিনা পণ্যমূল্যে বিক্রয় করিতে বসিয়াছি, ইহা অপেক্ষা দুঃখের আর কি থাকিতে পারে? আমার আনন্দ ও বেদনার মধ্য দিয়া আমারই হৃদয়ের একান্তে যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহাকে সহস্রের বিচারবুদ্ধি, ভালোমন্দ পরখের মাঝখানে রাখিয়া দেখিতে হইবে—দুঃখ হয় না কি!......"

প্রশান্ত নিবিষ্টমনে লিখিয়া চলিয়াছিল। রাত্রি সুগভীর। শ্রাবণের নক্ষত্রহীন কালো আকাশটা যেন জানালার কাছে মুখ পাতিয়া আছে—থম্‌থমে, গম্ভীর। টেবিলের ওপর ল্যাম্পটা পুড়িয়া পুড়িয়া ম্লান আলো ছড়াইতেছিল। তারই একপাশে ছোট একটা ফুলদানীতে ফুলের বোঁটা ও পাতাগুলি শুকাইয়া রহিয়াছে, পাপ্‌ড়িগুলি নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে—সাতদিনের মধ্যেও উহা বদ্‌লানো হয় নাই। টেবিলখানাও ছোট্ট, কারণ ঘরে জায়গা কম। কোন এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের চিঠি চাপা রহিয়াছে ফুলদানীটার নীচে—ওটার নাম তাই আজকাল পেপার-ওয়েট দিলেই মানায় ভালো।

হঠাৎ প্রশান্তর লেখা বন্ধ হইল। একটা কাঁচের গ্লাস মাটীতে পড়িয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল—প্রশান্ত চমকিয়া দেখে, একটা ইঁদুর পলাইয়া গেল। ওর ভারী হাসি পাইল। কাছেই তক্তপোষের উপর অলকা ছেলে বুকে করিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—একটা গ্লাস পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল তবু একটু টেরও পাইল না। কী ঘুম ওর। প্রশান্ত কলমটা রাখিয়া নিদ্রিত অলকার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এই সেই "অলি"—যার গুণগুণানিতে প্রশান্তর কত রাত্রির ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, নিজের দেওয়া সংক্ষিপ্ত নামটুকুর এতখানি সার্থকতা দেখিয়া বিরক্তির মধ্যেও হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত। "অলি" যখন ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রাণ হইয়া মুখ ফিরাইয়া থাকিত, প্রশান্ত তখন ঘুমের মধ্যেই হাত বাড়াইয়া ডাকিত "অলি, ও অলি! শোন্, মুখ ফেরা"—অলকা আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিত না। মুখখানি প্রশান্তর বুকের মধ্যে গুঁজিয়া লইয়া আস্তে বলিত—"কুম্ভ্" অর্থাৎ কুম্ভকর্ণ! অলকার সেই চটুলতা আর নাই। সেই বিপুল আকর্ষণ, সেই প্রশান্তকে কাছে পাইলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যাওয়ার মত মনও আজ তাহার নাই। মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে তারুণ্যের দীপ্তিটুকুও আজ ঢাকা পড়িয়াছে।

অলকার শিয়রের কাছে একটা স্পিরিট ষ্টোভ্, গ্লাসে ভর্ত্তি জল, বিলিতি ফুডের শিশি, বাটী, দেশলাই, সব গুছানো রহিয়াছে। অলকা শুইবার আগে ছেলের রাত্রির খাবারের জন্য এগুলি গুছাইয়া লইয়া শোয়। গভীর রাত্রিতে টেব্‌ল্ ল্যাম্পের মৃদু আলোকে ঘরটার চারিদিকে চাহিয়া প্রশান্তর ভারী অদ্ভুত মনে হইল। এমন করিয়া যেন সে আর কোনদিনই নিজের ঘরখানার দিকে তাকাইয়া দেখে নাই। ঐ র‍্যাকেটটায় কাপড় ও জামাগুলি ঝুলিতেছে, তাকের উপর খোকার

ওষুধের শিশিগুলি জড়ো হইয়া আছে, ঘরের এককোণে ধোয়ামাজা বাসনের স্তূপ, পাশের আলমারীটা রঙীন শাড়ী, খেলনা, কাঁচের বাসন লইয়া ছোটখাটো একটা প্রদর্শনীর মতো, উপরের দেয়ালে সেই কবেকার আঁকা একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ ধূলায় ঢাকিয়া আছে—সব মিলিয়া মিশিয়া দস্তুরমত একটা সংসার। হ্যাঁ, প্রশান্ত আজকাল সংসারী, সে ঘর বাঁধিয়াছে। ঘরটির কোথাও চূণবালি খসিয়া পড়িতেছে, জল ঢালিবার নালার ভিতর দিয়া ইঁদুর আসিয়া অহরহ দৌরাত্ম্য করে, আলো যদিও কিছু পাওয়া যায় হাওয়া মোটেই ঢোকেনা, মশার উপদ্রবও তেমনি। তবু অলকা সাজাইয়া গুছাইয়া এমন করিয়া রাখিয়াছে যে, এই স্বল্পায়তন ঘরটির প্রতি প্রশান্তর একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রশান্ত নিজেই আশ্চর্য্য হয়, কেমন করিয়া তাহার সেই প্রথম যৌবনের কল্পনা-বিলাসী মনটা আস্তে আস্তে এই ছোট্ট একটা সংসারীর সঙ্গে আর পাঁচজনের মতই খাপ খাইয়া গেল! সেই অভাব, সেই অভিযোগ, সেই প্রতিদিনের কামনাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা, সবই ত আছে; তবু, তবু এরই মধ্যে পাঁচ বছর তাহার কাটিয়া গেল—মনটা এক একবার মোচড় খাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায় কিন্তু পরক্ষণেই আবার অলকার মুখের পানে চাহিয়া চিরাভ্যস্ত পথে চলিতে সুরু করিয়া দেয়। ভাবিবার সময় থাকেনা, তার আগেই ডাক আসে, "ওগো, কয়লা নেই কিন্তু" কি "খোকার আর দুটো জামা চাই"। প্রশান্তর হাসি পায়।

মনে পড়ে, প্রথম যখন সে কলিকাতায় আসে। অতি সহজেই গায়ত্রীদের বাড়ী টিউশনিটা জুটিয়া গিয়াছিল। গায়ত্রী ও তার দুই ভাই সুবোধ ও বাব্‌লুকে পড়াইতে হইত। সুশীলবাবুর এই তিনটি মাত্র সন্তান। গায়ত্রী সকলের বড়ো। দেশের কিছু জমিজমা এবং

ডালি

কলিকাতায় কোন একটা পাটকলে কুলি-কণ্ট্রাক্‌টারী করিয়া সচ্ছলভাবে সংসার চালাইয়াও তিনি ব্যাঙ্কের খাতায় বেশ কিছু জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। দূর আত্মীয়ের বাসায় অবাঞ্ছিত আতিথ্য ছাড়িয়া গায়ত্রীদের বাড়ীর এই টিউশনিটা পাইয়া প্রশান্ত একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছিল। গায়ত্রী যত না পড়িত, আবদার ধরিত তার চেয়ে বেশী। নতুন ফিল্‌ম্ আসিয়াছে, অমনি সে ধরিল—চলুন শান্তদা, ফার্ষ্ট শো'তেই দেখা চাই। প্রশান্ত প্রথমে অস্বীকার করিলেও শেষ পর্য্যন্ত সুশীলবাবুর ভর্তি গাড়ীর সামনের সীটে বাব্‌লুকে কোলে নিয়া বসিতেই হইত। প্রশান্ত এই সংসারটির ভিতরে বাড়ীর ছেলের মতই মিশিয়া গিয়াছিল।

প্রশান্ত যে কবি তাহা গায়ত্রীর আবিষ্কার। অনুরাগীমাত্রের উপরই কবিহৃদয়ের বোধ হয় একটা দুর্ব্বলতা আছে। প্রথম জীবনের লেখার উপর অনাত্মীয়া তরুণীর আকর্ষণ যে কত লোভনীয়, মনে হইলে আজও আনন্দে বুকটা তাহার শিহরিয়া ওঠে। গায়ত্রীর বুদ্ধি ও ভালোমন্দ বিচারের প্রকাশভঙ্গীটি এত মধুর ও সুসমঞ্জস্য ছিল যে তাহার দিকে সে মুগ্ধভাবে না চাহিয়া পারিত না। গায়ত্রীর সেই মুখ, সেই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার মনে তেমনিভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহা কখনও মুছিবার নয়। শান্তদা'র কাছে আবদারের অনুপম সুরটী আজও যেন কাণে লাগিয়া আছে। ভালো তাহাকে লাগিত সত্যই কিন্তু আশ্রিত ও অনুগ্রহজীবী হইয়া ভালোবাসিবার মত দুঃসাহস তাহার হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল? পারিয়াছিল কি গায়ত্রীকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে? চক্ষুর অন্তরালে পদ্মার তীরভূমি যেমন তলে তলে বহুদূর পর্য্যন্ত খাইয়া যায় ও ধ্বসিয়া পড়িবার মত

হইলেও বাহিরের রূপটি তার বজায় থাকে, তেমনি অন্তরের অন্ধকারে ভাঙন স্বরু হইয়া থাকিলেও বাহিরের ব্যবধানের সীমা ছাপাইয়া কখনো তাহা ফুটিয়া ওঠে নাই। ভিতরটা দুজনের কাছেই দুজনের ধরা পড়িয়া গিয়াছিল—অপরিচয়ের লেশমাত্র ছিল না সেখানে।

আজ জীবনে তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে—গায়ত্রী বিয়ের এক বছরের মধ্যেই স্বামীকে হারাইয়াছে, প্রশান্তও বিবাহ করিয়াছে, একটি ছেলেও তাহার হইয়াছে; যে-কবিতা লিখিয়া একদিন শুধু গায়ত্রীর হাসি ও সমালোচনার প্রত্যাশা করিত, আজ তাহা সংসার প্রতিপালনের জন্য টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিতে হয়—প্রশান্তর কাছে জীবনের পরিণতিটা যেন বিধাতার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। দূরে, অনেকখানি দূরেই সে সরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু একী অদ্ভুত, সেই বিদায়দিনের ম্লান অপরাহ্নে গায়ত্রীর জলে-ভরা, নীরবে-চেয়ে-থাকা চোখ দুটিকে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। যাহা দূরে সরিয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই মুছিয়া যায় না কেন? ভাবিতে ভাবিতে প্রশান্তর চোখে তন্দ্রা ঘনাইয়া আসে। আস্‌বাবে ভরা ক্ষুদ্রায়তন ঘরটি, অলকার নিদ্রাচ্ছন্ন মুখখানি, টেব্‌ল্‌ ল্যাম্পের আলো সবই ক্রমে অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।

অলকা ছোট মাটীর টবে করিয়া একটী মাধবীলতা জানালার সামনে অতি যত্নে বড় করিয়া তুলিয়াছিল—তার শাখাপ্রশাখায় তারের জালে ঢাকা জানালাটা প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফাঁকে এক ঝলক রোদ আসিয়া প্রশান্তর চোখে মুখে পড়াতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বেশ বেলা হইয়াছে, তবু নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা যায়।

ডালি

গতরাত্রির চিন্তাটা যেন আবার একটু একটু করিয়া পাইয়া বসিতে চায়। "দূর ছাই"—প্রশান্ত চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উঠিয়া বসে, চীৎকার করিয়া ডাকে, "অলি, অলি"।

অলকা চা লইয়া আসে। প্রশান্ত তাহার মুখের দিকে না চাহিয়াই চায়ের কাপটা হাতে লয়।

আজ দু তিনদিন বাজার আসে নাই—অলকার মনে বিরক্তি জমিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "আচ্ছা, তুমি কি ভাবলে বলোত ?"

প্রশান্ত নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দেয়।

কোনও উত্তর না পাইয়া অলকা রাগিয়া উঠিল, বলিল, "তোমার মত পুরুষের বিয়ে না করাই উচিত ছিল।"

"না কর্‌লে বাঙ্‌লাদেশে আইবুড় মেয়ের সংখ্যা আর একটি বাড়ত" —প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বলে।

অলকা আরও চটিয়া যায় ; "থাক্ থাক্, আর রগড় করতে হবেনা। খেতে হয়ত রান্নাবান্না দেখে নিও, আমি ওসব কিছু করতে পারব না" —অলকা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

প্রশান্ত উদাসীনের মত বলে, "রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার"— পরক্ষণেই ডাকিয়া বলে, "কিন্তু আমার যে কেষ্টা নেই অলি, ও অলি"— অলকা ফেরেনা।

প্রশান্ত বাজার লইয়া যখন ফিরিল, পিয়নের হাত হইতে একটি অপরিচিত হস্তাক্ষরের চিঠি সে পাইল। চিঠিখানি খুলিয়া সে বিস্মিত হয়—নীচে লেখা আছে' "ইতি আপনার অত্রি"।

"গায়ত্রী"—

প্রশান্তর বিশ্বাস হয় না, চিঠিটাতে আবার চোখ বুলাইয়া লয়। গায়ত্রী লিখিয়াছে—

শান্তদা! অনেকদিন পরে কলকাতায় এসেছি—একবার দেখা পেলে খুসী হব। "বিচিত্রিতা"য় আপনার একটা গল্প পড়লুম, ভারী সুন্দর হয়েছে। কিন্তু শান্তদা, কে এই আপনার গল্পের অণিমা? তাকে এমন করে টেনে নামিয়ে আনলেন কেন? স্বামীহীনার একান্ত নির্জ্জন অন্তরটাকে লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলিতে গেলেন কেন? এ আপনার ভারী অন্যায়। আচ্ছা শান্তদা, কবিরা শুধু কল্পনাই করে, না? গল্পটা পড়ে অবধি কেবলই মনে হচ্ছে, আপনার সঙ্গে একচোট ঝগড়া করবো। বলুন ত, কতদিন...আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি! আস্‌বেন কিন্তু, নইলে ভীষণ রাগ করবো। নমস্কার নেবেন। ইতি

আপনার 'অত্রি'

গায়ত্রী কখনো চিঠি লিখিতে পারে ইহা প্রশান্ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। চিঠিটা হাতে লইয়া স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া থাকে। গতরাত্রে একটা জীবন-স্মৃতি লিখিতে বসিয়া কত কথা সে ভাবিয়াছে; এমন ত কতদিনই হয়। কল্পনা করিয়া তাহাকে জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয়—মাসিকে, সাপ্তাহিকে লিখিয়া তবে সংসার চালাইতে হয়। কিন্তু গায়ত্রীর চিঠি? এ যে কল্পনাকেও ছাড়াইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, যে ছিন্নসূত্রকে ধরিয়া সে টান দিয়াছে সেই প্রথম জীবনের ব্যর্থ দিনগুলির কি এখন কোন মূল্য আছে? সেই অতীতকে কি আর এখনকার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যায়? দুজনেরই জীবনে কত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে—সেই প্রশান্ত নাই, সেদিনের সেই গায়ত্রীও আজ আর

নাই। তবু প্রশান্ত এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হয়, তার মত গায়ত্রীও তাহাকে এখনো ভুলিতে পারে নাই। মূল্য থাক্ আর না-ই থাক্, একটা কৌতূহলমিশ্রিত আনন্দে প্রশান্তর সমস্ত অন্তর ভরিয়া ওঠে।

অলকা কি একটা কথা বলিতে আসিয়া দেখে, প্রশান্ত একখানা কাগজ হাতে করিয়া চিন্তায় ডুবিয়া আছে। হয়ত কোন সম্পাদকের চিঠি—অলকা নিঃশব্দে ফিরিয়া যায়।

বিকেলবেলা—বাহিরে যাইবার পারিপাট্য যে কোন্ অসতর্ক মূহুর্ত্তে দৈনন্দিন স্বাভাবিকতার সীমাকে অতিক্রম করিয়াছিল তাহা নিজে বুঝিতে পারি নাই। ধরা পড়িল অলকার চোখে। জিজ্ঞাসা করিল, "বিকেলে তোমার রান্না হবেনা ত?"

"কেন?"

"মনে হচ্ছে, কোনো বান্ধবীর বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে!"

কেমন একটু চমকাইযা উঠিলাম। আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া একবার নিজেকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম। হাসিয়া বলিলাম, "ওঃ, তাই! তোমার জন্যে আর ফরসা জামাকাপড় পড়বার উপায় নেই।"

"কোথায় যাচ্ছ শুনি?"

"যাচ্ছি—একটা মিটিং আছে…"

"আমায় একটু ভবানীপুর নিয়ে চলোনা, ফেরার পথে আবার নিয়ে এসো; অনেকদিন যাইনি মল্লিকার বাড়ী বেড়াতে—"

মনটা খচ্ করিয়া ওঠে; অলি কি গায়ত্রীর চিঠি দেখিতে পাইয়াছে? তা নইলে, আজই আমাকে দেরী করাইবার ওর এত আগ্রহ কেন? বিবাহিত মেয়েগুলোর ধরণই এই—কেবল সন্দেহ, কেবল সংশয়—

পুরুষকে ওরা যেন আঁচলে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। মনটা ভিতরে ভিতরে কঠিন হইয়া ওঠে।

"কি গো, নেবে?" অলি আবার প্রশ্ন করে।

"না না, পাঁচটায় মিটিং—আজ একেবারেই সময় নেই"—অলিকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়া বাহির হইয়া পড়ি।

বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়াইয়া ভাবি, হয়ত গায়ত্রী এতক্ষণ আমার আশায় বসিয়া আছে, হয়ত বা আমার দেরী দেখিয়া অন্য কোথাও বাহির হইয়া গিয়াছে, রাজার দুলালী দরিদ্র কবিকে একবার যে স্মরণ করিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু কি বলিবে গায়ত্রী, কি বলিতে পারে? ওর ভাগ্যের কথা? বিধাতা যে জ্বলন্ত সিন্দূরের দাগটা ললাট হইতে মুছিয়া দিলেন সেই দুঃখের কাহিনী?

নীচের তলায় বাব্‌লু ক্যারাম খেলিতেছিল—পাড়ার আরও তিন চারিটি ছেলেকে লইয়া। আমাকে দেখিয়াই সে নাচিয়া উঠিল, বলিল, "চলুন ওপরে"। বাব্‌লু আমাকে একরকম টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। সমস্ত বাড়ীটা অনেকখানি নিঝুম মনে হইল। দোতলায় দক্ষিণ প্রান্তের ঘরটির সামনে আনিয়া দাঁড় করাইয়া সে ছুটী নিল।

ঘরের মাঝখানে গায়ত্রী তার সেতারটাকে কোলের কাছে লইয়া বাজাইয়া চলিয়াছে—পূরবীতে তুলিয়াছে তান। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া মেঘমুক্ত দিগন্তের এক টুক্‌রা আলো আসিয়া গায়ত্রীর কোঁকড়ান চুলের গুচ্ছ ছুঁইয়া আছে। আমি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একটী বেতের মোড়ার উপরে বসিয়া পড়িলাম। গায়ত্রী টের পাইল কি না বুঝিলাম না। তার পূরবীতে তখন ঝঙ্কার উঠিয়াছে।

অতীতের চিহ্নগুলি চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম: এ বাড়ীতে থাকিতে এ ঘরখানি আমারই জন্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। জানালা দিয়া যে বাদাম গাছটা আগে ছোট্ট দেখাইত, আজ তাহা জানালা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ওদিকের পোড়ো জায়গাটা—যেখানে কতদিন টেনিস্ খেলিয়াছি—সেখানে নতুন একখানা বাড়ী উঠিয়াছে। ঐ দক্ষিণের আকাশটা আমার চেনা; কতদিন কত প্রভাতে সন্ধ্যায় ঐ একফালি আকাশের ঐশ্বর্য্য মুগ্ধদৃষ্টিতে বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছি। কতদিন হঠাৎ আকাশখানিকে আড়াল করিয়া, জানালাতে ঠেস্ দিয়া, চোখের সামনে গায়ত্রী আসিয়া দাঁড়াইত। বলিত, "কি দেখেন আপনি চেয়ে চেয়ে, এঁ্যা?" ঘরের দেয়ালে ঐ যে এখনো আমার আঁকা দুখানা ল্যাণ্ড্স্কেপ। আলমারীর বইগুলোতে এখনো আমার হাতে লেখা নম্বর। এঘর হইতে আমি এখনো মুছিয়া যাই নাই, এখানে আমি সেই তরুণ কবি প্রশান্ত···

"পরিশ্রমটা আমার সার্থক হলো দেখ্‌চি"—

গায়ত্রীর কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া চাহিলাম। পূরবীর ঝঙ্কার কখন শেষ হইয়াছে টের পাই নাই। মুখ ফিরাইতেই চোখে চোখ পড়িয়া গেল। গায়ত্রী বলিল, "আজ সকাল থেকে মনে হয়েছে, আপনি আসবেনই।"

"আসবো-ই?"

গায়ত্রী হাসিয়া বলিল, "ঠাট্টা নয়, আমার মনে হলো যে তাই!"

"তাই বুঝি কথা না বলে' সুরের মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করলে, কি বলো?"

গায়ত্রী কথা বলিল না; মুখে তার তেমনি হাসি, চোখ দুটি উজ্জ্বল—এ যেন প্রথম যৌবনের চপল আভা। মধ্যেকার পাঁচ বছরের দীর্ঘ ফাঁকটা যেন মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মনটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটু কৌতুকের সঙ্গেই বলিলাম, "কিন্তু অত্রি! পূরবী যে বিদায়ের সুর, আবাহন ত এতে বাজেনা।"

গায়ত্রী বলিয়া ওঠে, "না শান্তদা! আমার কিন্তু মনে হয় উল্‌টো; মনের একান্ত যে আহ্বান তা-ই এতে বাজে। তাইত, কাল্‌কে চিঠিটা ডাকে দিয়ে অবধি ভেবেচি, কবি আস্‌বেন, তাঁকে ত আর শুধু আসুন বলে' অভ্যর্থনা করা চলেনা, একটু কাব্যিক পরিবেশ তাঁর জন্যে চাই। আচ্ছা, আপনিই বলুন, মুখে বলাটা কি আর এর চেয়ে সুন্দর হতো কিছু?"

"কোন্‌টা অসুন্দর কেমন করে বলি? মহাশ্বেতা যে বীণ বাজিয়েছিল, সেও তার আপন মনের ছন্দে। কিন্তু তার বীণার ছন্দে আর বাণীর ছন্দে অমিল থাকলেও অসুন্দর ছিল না কোনোটাই।

গায়ত্রীর মুখ আরক্ত হইয়া ওঠে। কথাটাকে ঘুরাইয়া লই, "আচ্ছা অত্রি, যদি আজ না আসতুম?"

হাসিয়া ওঠে গায়ত্রী—অবিশ্বাসের হাসি। যেন না আসাটা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

না বলিয়া পারিলাম না, "তুমি যেন ভুলেই যাচ্ছ, আমি আর সেই শান্তদা নেই—এখন আমি অলকার স্বামী, বুলুর বাবা,—বাজার করতে হয়, কয়লা কিনতে হয়, বুলুর আবদার সইতে হয়, বউয়ের বকুনি খেতে হয়………"

হি—হি করিয়া হাসিয়া ওঠে গায়ত্রী, বলে, "আমাদের কাছে কিন্তু আপনি সেই শান্তদা—সেই আকাশের দিকে চেয়ে থাকা, কলম হাতে নিয়ে রাত-জাগা, রাবীন্দ্রিক ছন্দে হাতের লেখা, কি বলুন, আপনি সেই শান্তদা নন্?"……

চোখে মুখে এমন একটা চটুল ভঙ্গী লইয়া গায়ত্রী আমার দিকে তাকায়, মনে হয়, আমার দীর্ঘ পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনটা ওর কাছে মিথ্যা। ওর হাসিতে আজও নেশা ধরে, চোখের উজ্জ্বলতায় অতীতের প্রশান্ত মাথা-নাড়া দিয়া ওঠে।

"গায়ত্রী ?"

বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি গায়ত্রীর মা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"শান্তকে চা এনে দিলিনে ?" – গায়ত্রী উঠিয়া গেল। আমিও উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

অনেক কথাই হইল—সুশীলবাবু ক'দিনের জন্য বেনারস গিয়াছেন। তাঁর শরীর আগের চেয়ে খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সুবোধ আজকাল এলাহাবাদে তার মামার কাছে থাকিয়া কলেজে পড়ে। গায়ত্রীর জন্যই এখন সংসারে কারো মনে আনন্দ নাই। এই বলিয়া তিনি চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। আমিও স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

গায়ত্রী চা লইয়া আসিলে তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেলেন।

গায়ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম। এই বেদনাময় স্তব্ধতা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে কিনা বুঝিতে পারিলাম না। আমি নিজেও এমনি সহানুভূতিভরা মন লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু গায়ত্রীর কাছে আসিয়া কোন্ মুহূর্ত্তে তাহা অদৃশ্য হইয়াছিল, নিজেই টের পাই নাই। এখনও চাহিয়া দেখি, সে-মুখের কোথাও বেদনার চিহ্নমাত্র নাই। সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যে আজ যেন একটা সার্থক সন্ধ্যা ওর দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গায়ত্রী ইহাকে নিরানন্দে ম্লান করিতে চাহে না।

"শান্তদা ?"

"কি" ?

"আপনার অণিমা কি শুধু কল্পনা ?"

"ও! আমার সেই 'বিচিত্রতা'র গল্প ? হ্যাঁ, তা……তা কল্পনা ছাড়া আর কি ?"

"আপনিই না একদিন বলেছিলেন, শুধু কল্পনায় সাহিত্য গড়ে' ওঠে না, সত্যও তাতে থাকে ?"

মনে মনে চম্‌কাইয়া উঠি। সত্যকে স্বীকার করিতে এত সঙ্কোচ কেন আসে ? আমি যে শিল্পী! আমি আহরণ করি! যাহা দেখি, যাহা অনুভব করি, মর্ম্মতলে আসিয়া যে ছায়া পড়ে, বিচিত্র বর্ণরাগে রঙীন করিয়া, গুচ্ছ বাঁধিয়া তাহাই সকলের হাতে তুলিয়া দিই। আমি ত বাঁধা পড়িনা কোথাও। তবু এ সঙ্কোচ আসে কেন ? গায়ত্রী জানুক, অণিমা মিথ্যা-কল্পনা নয়; আয়নার মত অণিমার মধ্যে সে আপনাকে দেখিয়া লউক। গায়ত্রী আজ এই মূহুর্ত্তে আমার চোখের সামনে যেমন সত্য, তেমনি সত্য ওই অণিমা—অরবিন্দের পাশে আনিয়া যাহাকে দাঁড় করাইয়াছি সেই গল্পের অণিমা এই গায়ত্রীর মতই সত্য সত্য সত্য।

"কি ভাব্‌চেন শান্তদা ?"

"ভাব্‌চি, সত্য যদি কিছু থাকেই তাতে তোমার লাভ ?"

"লাভক্ষতি, ভালোমন্দ, পাপপুণ্যের কথা ত বল্‌চিনে; সত্য যদি হয় তবে তার বিবাহিত জীবনটাকে এমন মিথ্যে ক'রে দিলেন কেন, তার কি কোন মূল্যই নেই ?"

"আমার কি মনে হয় জানো অত্রি ? জীবনের প্রতি মূহুর্ত্তের সঞ্চয়ই সত্য—তাতে তফাৎ থাকতে পারে, বিরোধ থাকতে পারে,

আজকের সঙ্গে কালকের, এবেলার সঙ্গে ওবেলার সামঞ্জস্য না থাকতে পারে কিন্তু তার কোনটাকেই অস্বীকার করবার যো নেই। আশ্চর্য্য এই যে, একটা অবিচ্ছিন্ন সরলরেখায় জ্যামিতির সূত্রের মতো জীবনটাকে বাঁধা চলেনা অত্রি। অণিমার কৈশোরের স্বপ্ন একদিন ভেঙ্গে গিয়েছিল—পরিণতবয়সে আবার তাকে অরবিন্দের সামনে দাঁড় করিয়ে দেখলুম, কী সে বলতে চায়। কি দেখলুম জানো অত্রি! মরেনি, সেই কিশোরী অণিমা অরবিন্দের সামনে অনন্তকাল ধরে' সূর্য্যমুখীর মতো মনের পাপ্‌ড়িগুলো মেলে রাখবে, হোক্ সে ভাষাহীন, হোক্ সে নিস্পন্দ, তবু কোনো বন্ধনে, কোন বেদনায় সে তার অস্তিত্ব হারাবেনা—কি বলবে একে অত্রি? এ কি সত্য না এ কল্পনা?……"

গায়ত্রীর মুখে কোন কথা নাই। তাহার চক্ষু নত হইয়া পড়িয়াছে।

আবার বলিলাম, "মূল্য কোন্‌টির দেওয়া চলে অত্রি! মানুষের বিচারে যা ব্যর্থ হলো তার, না বিধাতা যাকে ব্যর্থ করে দিল তার—"

আর কিছু বলিতে পারিলাম না। গায়ত্রীর দিকে চাহিতে গেলে বোধ হয় চোখে জল আসিয়া পড়িবে। মুখ ফিরাইয়া আমার সেই পুরানো দক্ষিণ আকাশের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। শ্রাবণের রাত্রি—পাশের নতুন বাড়ী হইতে দরদীকণ্ঠে কে গান ধরিয়াছে—

"তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার…

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়,
এমন মেঘস্বরে……"

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, গায়ত্রীর চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

"অত্রি! অত্রি!"—বেতের মোড়া হইতে নামিয়া আসিয়া গায়ত্রীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলাম।

মুহূর্তমাত্র; পরক্ষণেই সে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না না, এ সত্য নয় শান্তদা, এ কল্পনা, এ আপনার মন-গড়া······"

আমি নির্ব্বাক্, নিরুত্তর—নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিলাম।

পথে যখন বাহির হইলাম, রাত্রি তখন গভীর। ট্রাম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গায়ত্রীর মা না খাইয়া কিছুতেই আসিতে দিলেন না। গায়ত্রীরও অনুরোধ, কারণ সে কালই গিরিডিতে শ্বশুরের কাছে চলিয়া যাইবে। আবার কবে দেখা হয় কে জানে? আসিবার সময় গেটের কাছে আসিয়া একগুচ্ছ রজনীগন্ধা সে নিঃশব্দে হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে অজস্রবার শুভ্র ফুলগুলির দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি—সুরভি যদি ভাষা হইয়া ফুটিতে পারিত তবে ইহারা কি বলিত?

বাড়ী আসিয়া দেখি অলকা তখনো কি সেলাই করিতেছে, আমি না খাইলে তার খাওয়া হয় না।

ফুলগুলির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে বলিল, "বাঃ, গুচ্ছের রজনীগন্ধা! মিটিংয়ে তুমি 'প্রিসাইড্' করলে বুঝি?"

কথা বলিলাম না। জামাকাপড় বদলাইয়া বিছানায় গা ঢালিয়া দিলাম। সর্ব্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত অবসাদ নামিয়াছে।

ডালি

"এ কি, খাবেনা তুমি ?"

"খেয়ে এসেছি"

"তা বলে গেলেই পারতে ; ভাবো, একটা বাঁদীত আছেই, আর ভাবনা কি ?" বলিয়া অলকা রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল। অলকা খাইয়া আসিয়া আমাকে ডাকিল, "ওগো শুন্‌চো ?"

"কি ?"

"বুলুর একটু গা-গরম হয়েছে, কালকে ক্ষিতীশ ডাক্তারকে একবার ডাকতে হবে।"

"হুঁ"

"আর—আঃ কী ঘুমই যে তোমার ! বলি শুন্‌চো ?"

"হুঁ, হুঁ—"

"কালকে আমাকে একটা ক্যাস্‌ সার্টিফিকেট কিনে দেবে ? আমিই টাকা দেব—"

"দিও"—ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসে।

অলকা আলোটাকে নিবাইয়া বুলু ও আমার মাঝখানে আসিয়া নিরুদ্বেগে শুইয়া পড়ে। একদিকে তার প্রিয়তম পুত্র আর অন্যদিকে আমি —আমি প্রশান্ত—অলকার পাঁচ বছরের বিশ্বস্ত স্বামী।

প্রাণের দান

অনুরূপা দেবী

নবযৌবনা তরুণীর মতই বর্ষাসিঞ্চিত জলভার গৌরবে গৌরবময়ী দুকূলপ্লাবী মধুমতী নদী তরঙ্গভঙ্গিমায় নাচিয়া চলিয়াছে।

তীরে বর্ষাবায়ুহিল্লোলে তেমনি করিয়াই কম্পিত হইতেছিল নব জলধারাপুষ্ট সুশ্যামল শস্য এবং শষ্পরাজি। পরপারে বনরাজিনীল প্রান্তর দিকচক্রবালের অঙ্গে ঘনমসীলেখার মত নিলীন হইয়া আছে। মনে হয় না উহা জীবন্ত, মনে হয় শক্তিমান চিত্রকরের হাতে চিত্রিত ছবিখানি।

এপারে বন্যা আসিতেছে বলিয়া অদূরবর্ত্তী কুটিরবাসিদিগের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। সকলেই ক্ষণে ক্ষণে চকিত চমকে বারে বারে নদীবক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। গোলা মরাই বা ছোটোখাটো যেটুকু যার সঞ্চয় আছে, প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, অথচ তার কোনো উপায় খুঁজিয়া পায়না, এমনই তারা দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে।

তবু যতটা পারে হাতে মাথায় বহিয়া কমদামে হাটে বেচিয়া যা পায় তাই লইয়া আসিতেছে। যাদের সঞ্চয়ের বালাই নাই, এরই মধ্যে তা'রা আড়াই মাইল পথ হাঁটিয়া ভিক্ষা করিতে সহরে আসা যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। শেষবেলায় বাড়ী ফিরিয়া চালের সঙ্গে মেশান ভুট্টার দানা না বাছিয়াই খড়কুটার আগুনে একসঙ্গে সিদ্ধ করিতে বসিয়া যায়;

সারাদিনের ক্ষুৎপিপাসা আর বাছ-বিচারের অপেক্ষা করিতে রাজী হয় না। তাছাড়া কথাতেই বলে ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

নদীর জল এতগুলি লোক-লোচনের ভয়ার্ত্ত কাতর দৃষ্টির অভিঘাতেও কিছুমাত্র বাধা মানিতে প্রস্তুত হয় না—দিনের পর দিন সে বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেন শুক্লপক্ষের শশিকলা—যেন নূতন জন্মান তরুলতা, অথবা বাড়ন্ত একটী দামাল শিশু। কোনোদিকে দৃক্‌পাত নাই, আপনার মনেই হাসিয়া খেলিয়া উদ্দাম চাপল্যে নৃত্য করিয়া পূর্ণস্বাস্থ্যের সতেজ বৃদ্ধিতে তরতর করিয়া বাড়িতেছে। তটের উপর যখন তখন ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে ছলাৎছল। মধ্যে মধ্যে ঘন আঘাতের ব্যথায় ক্ষীণমধ্য তটভূমি অস্ফুট আর্ত্তনাদে তাহার বক্ষের মধ্যে ঢলিয়া পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়—নদী সেই ফাঁকে আর একটুখানি স্থান দখল করিয়া লইয়া আর একটুখানি অগ্রসর হইতেছে। এমনি করিয়াই কতস্থল, কত ভূমি, কত দেশ, কত মহাদেশকেও সে আপনার বিরাট জঠর মধ্যে স্থানদান করিয়া থাকে—আবার উল্টাদিকে কত নূতন নূতন দেশ রচনা করিয়া দেয়। পুরাতন গত হয়, নূতনের উদ্ভব হইতে থাকে। আবার একদা হয়ত সেই বিগতই নবাবিস্কারের নূতন বিস্ময়ে মানব সমাজকে চমকিত করিয়া দিয়া অকস্মাৎ নূতন হইয়া দেখা দেয়। এই রকম লুকোচুরি খেলাটাই পুরাতনে এবং নূতনে চিরদিন ধরিয়া চলিতে থাকে। প্রকৃতিদেবীর এই দেওয়া নেওয়ারই নাম সৃষ্টি ও লয়। ইহার মাঝখানে যেটুকু স্বল্পকাল তাহাই স্থিতি।

বর্ষার আকাশে এক পশলা জলের পর মেঘগুলা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তা'দের ব্যবধান পথের ফাঁকে ফাঁকে ঈষৎ পীতাভ শরৎ

রৌদ্রের সূচনা দেখা দিয়াছিল। সেই রৌদ্ররঞ্জিত পুঞ্জিত মেঘস্তর আকাশের গায়ে নানা মূর্ত্তিতে ও নানা আকারে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন একটা বিচিত্রতর শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। তা'দের কোনোটার রূপ ধবলগিরির মত, কোনোটার রং পৌরাণিক মৈনাক পাহাড়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। তা-ছাড়া অধিকাংশই শুঁড় দোলান মত্ত হস্তী। হাতীগুলার মধ্যে সাদাও আছে কালোও আছে।

কিশোর 'হাঁ' করিয়া ঐগুলোকে দেখিতেছিল। ওর ঐ রকম দেখা একটা রোগ। নানারকম কল্পনা করিয়া ওরই ভিতর বাড়ী, পাহাড়, উট এবং মানুষ এমন কি মেয়েমানুষের মুখও দেখিতে পায়। একদিন একটী সাদা মেঘের ছোট্ট টুক্‌রার ভিতর সে শ্যামার মুখের ছাঁচ আবিষ্কার করিয়াছিল। সেই কথা সে তাহাকে খুব উৎসাহ করিয়া বলিতে গেলে, শ্যামার গর্ব্বিত ঠোঁটের পাশে এতটুকু একটুখানি অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার কঠিন মুখখানাকে কঠিনতর করিয়া তুলিয়াছিল। সে খুব সংক্ষেপে মাত্র উত্তর দিয়াছিল—"তুই পাগল হয়ে যাবি।"

কিশোর ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে নাই, বিস্ময়লেশহীন প্রশান্তকণ্ঠে সেও প্রত্যুত্তর করে, "যাবো কি? হয়েইছি।" তারপর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে "কিন্তু তুইই আমায় পাগল করেছিস্ শ্যামা! তুই যদি অমন না হতিস্, আমিও পাগল হতুম না।"

শ্যামা ইহার উত্তরে তার কঠিন হাসি হাসিয়া বলে "আমি তোকে পাগল না করি, তুই-ই আমায় পাগল ক'রে ছাড়বি! এমন বদ্ধ পাগল তো কোথাও দেখিনি!"

এর পর সে দৃঢ় করিয়া পা ফেলিয়া তাদের বাড়ীর পথে চলিয়া যায়।

পিছন হইতে যে দুইটী হতাশ-কাতর চোখের দৃষ্টি তাহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিতে থাকে, তা'র খবরটুকুও সে লয় না। তা' এমন ঘটনা তো আর ঐ একটিবারই ঘটে নাই। কতবারই না উহার পুনরভিনয় হইয়াছে এবং হইতেছে। শ্যামা যখন নেহাৎ ছোট ছিল তখন হইতেই তো কিশোরের সে খেলার সাথী। দু'জনার মধ্যে ভালবাসারও তো কোনদিন কমতি ছিল না। এদের চালচলন দেখিয়া এদের দু'জনকার মা-ইতো ঠিক করিয়াছিল—বড় হইলে এ দু'জন স্বামী স্ত্রী হইয়া ঘর-করণা পাতাইয়া বসিবে। এরাও মনে মনে তাই জানিত। কিশোর আজও সেই স্বপ্ন দেখে; কিন্তু শ্যামার মনের সে স্বপ্ন-দেখা ঘুচিয়া গিয়াছে। আর সেই লইয়াই তো আজ যত কিছু বিসম্বাদ।

সেদিনকার মেঘের স্তরে অনেক কিছুই ফুটিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শ্যামার মুখ আর কিছুতেই ফোটাইতে পারা গেল না। বিরক্ত হইয়া কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর আলস্যে গা ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া ফেলিয়া-রাখা কাস্তেখানা কুড়াইয়া লইল। গরুর জন্য এক বোঝা ঘাস কাটিয়া না লইয়া গেলেই নয়। তার ঘরে ত আজ আর তার মা নাই। বৎসর ঘুরিতে যায়; অনাথ ছেলেকে সম্পূর্ণরূপেই অনাথ করিয়া দিয়া সে নিজের দুঃখের জীবন শেষ করিয়া গিয়াছে। কিশোরের ছন্নছাড়া সংসারের ভার লইবার কেহই নাই। ঘর-দুয়ার শ্রীহীন, গোলা-মরাই খসিয়া পড়িতেছে, রান্না তার প্রায়ই চড়ে না, ভাজাভুজি খাইয়া কোনমতে দিনটা কাটাইয়া দেয়। থাকার মধ্যে আছে তার একটী বাঁশের বাঁশী, আর একটী দুগ্ধবতী গাভী। গরুটীকে সে হেনস্থা করে না,

যত্ন করিয়াই সেবা করে। দুধ যেদিন ইচ্ছা দোয়, কাঁচাই খাইয়া ফেলে, সবদিন আবার তাও ভাল লাগেনা, তাই বাচ্ছাটীকে খাইতে ছাড়িয়া দেয়। শুধু শ্যামাই নয়, অনেকেই তাকে পাগল বলে—পাগলের মতই তার আচার আচরণ।

কলসী লইয়া শ্যামা জল লইতে এই সময়েই নদীর ধারে আসে। তার সঙ্গে আর একজনকে দেখা যায়—তাকে দেখিলেই কিশোরের গায়ে জ্বালা ধরিয়া যায়, সে নিতাই। নিতাই এ গাঁয়ের লোক নয়, সহুরে ছেলে। সেখানে সে কিসের একটা দোকানে না কোথায় কি যেন একটা চাকরী করে। চাক্‌রে' বলিয়া তা'র সবখানেই একটা খাতির আছে।

মাথায় ভুরভুরে নেবুর তেলের গন্ধে ভরা চুকচুকে চুলে সোজা সিঁথি কাটা, গায়ে জালিদার গেঞ্জির উপর হাঁটুঝুলের পাতলা পাঞ্জাবী, পায়ে শুঁড়তোলা লপেটা জুতো, হাতে পীচের পালিশ করা ছড়ি, যখন তখন শিষ্‌ দিয়া গ্রামোফোনের গান গায়—

"এমন বাদলে তুমি কোথা ?"

আবার শ্যামা কাছে আসিলে হাসিয়া গানের সুর ও কথা বদলায়—

"কি রূপ পেখনু যমুনা কি বাট।
একি নাগিনী যোগিনী কামিনীয়া ?
একি মথুরাবাসিনী গোয়ালিনী—"

শ্যামা হাসিয়া বলে "থাম থাম, লোকে শুনলে বলবে কি ? রূপইবা আমার কোথায় ? আমি তো কালো গো।"

নিতাই ঘাড় দুলাইয়া চোখ ঠারিয়া গান ধরে—

"কালোরূপে মজেছে এ মন—"

সে বোধ করি বা গ্রামোফোনের দোকানেই কাজ করে। নহিলে কথায় কথায় গান গায় কেমন করিয়া ? লেখাপড়া তো জানেনা।

...তা' শ্যামার মায়ের মন ছিল না ; কিন্তু মেয়ের একান্ত জিদ্, ধন্না দিয়া দুদিন নিরম্বু উপবাসে বিছানায় পড়িয়া রহিল। বেচারা মা আর কি করিবে ? নিতাই তা'কে বিয়ে করিয়া সহরে লইয়া যাইবে, ছোট্ট ছেলেটাকে লইয়া একাই জ্ঞানদা এই কুঁড়েখানায় পড়িয়া থাকিবে। তার রোগ-ব্যারাম আছে, আপদ-আত্তি আছে, কিশোর জামাই হইলে দেখাশুনা সে-ই করিত। কিন্তু মেয়ে যখন মায়ের এমন যুক্তিযুক্ত কথাতেও নিজের গোঁ ছাড়িল না, উল্টিয়া ঝঙ্কার ঝাড়িয়া বলিয়া বসিল—

"শোন কথা, তাই বলে চিরকালটা ধরে' এই পচা পাড়াগাঁয়ের মধ্যেই বসে থাকতে হবে ! সব্বাইকেইতো নিজের সুখ সুবিধের দিকে দেখতে হবে।" মা তখন মেয়ের উপর অভিমান করিয়াই এ বিবাহে সম্মতি দান করিল।

সেদিন হইতে কিশোরের বাঁশের বাঁশী গভীর বিনিদ্র রাত্রে করুণ বেদনার রাগিণীতে শ্রোতার চোখে না-জানা অশ্রুর বান ডাকায়। সারাদিন সে যে কোথায় থাকে, কেহ তার পাত্তাও পায় না। হঠাৎ কোন সময় দেখা যায়, নদীর কাছে কোন একটা ঝোপের ধারে আকাশের দিকে চাহিয়া বালুকা-শয্যায় সে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। দেহ তার দিনে দিনে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতেছিল। গাই দুহিতেও তার মনে পড়ে না, রান্নার পাটতো উঠিয়াই গিয়াছে। শ্যামার মা সব খবরই পায়, মেয়েকে অনুযোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে বলে, দেখ্ দেখি তোর জন্য প্রাণটা দিতে বসেছে, আর তুই ছুঁড়ি কিনা—

শ্যামা মায়ের কথা শেষ করিতে না দিয়াই ঝঙ্কার করিয়া উঠে,

"কেউ যদি ইচ্ছে সাধে প্রাণ দেয়, তার আমি কি করতে পারি? আমি কি ওকে প্রাণ দিতে ব'লেছি?"

একটা আনন্দে ভরা উচ্চ কলহাস্যের অতর্কিত আঘাতে অকস্মাৎ কিশোরের নিরানন্দ চিত্তের চিন্তাজাল খান খান হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

তার সমস্ত শরীর তার অজ্ঞাতেই যেন একবার গভীরপুলকে এবং তার পরক্ষণেই সুগভীর ব্যথায় শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবে না এ সঙ্কল্প প্রাণপণে করিতে থাকিলেও কে যেন জোর করিয়াই মুখখানাকে টান মারিয়া তার পিছন দিকে ফিরাইয়া দিল। সে দেখিল,—যা' দেখিল তা' তার জানাই ছিল। নিতায়ের সঙ্গে তার হাত ধরিয়া শ্যামা জল ভরিতে আসিয়াছে। তা'দেরই হাসি-কথার কলোচ্ছ্বাস ঢেউ তুলিয়া বাতাসের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতে পড়িতে অভাগা কিশোরেরও কাণের তারে আঘাত করিয়া গিয়াছে। শ্যামার পরণে রাঙ্গাপাড়ের হল্‌দে ডুরে, নিশ্চয়ই নিতাই তাকে সহর হইতে আনিয়া দিয়াছে! তা'র উঁচু খোপার চারদিকে কতকগুলি সেলুলয়েডের গোলাপী ফুল রংকরা কাঁটা দিয়ে গোঁজা—সেও ঐ নিতায়ের হাতেরই দান! কলসীকে বেড়িয়ে ধরা হাতখানাতে একগোছা নীললালে মিল করা কাঁচের চুড়ি। হাসির হিল্লোলে অঙ্গ দোলানীর সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে মধ্যে বসান কাঁচের আয়নাগুলো রোদ লাগিয়া চক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। কপালে পাথুরে পোকার মাঝারি একটা টিপ্। কিশোরের বুকের ভিতরটা কেমন এক রকম করিয়া উঠিল। তার মনে পড়িল—ঐ পাথুরে পোকা কত করিয়াই সে ওর জন্য খুঁজিয়া আনিয়াছিল! আজ তা-ই নিতায়ের দেওয়া অনেক কিছুর সঙ্গে তার দুঃসহ দুঃখের ভিতরকার এক এক ফোঁটা গোপন আনন্দ!

ভাবিতে গিয়া তার চোখে জল আসিয়া পড়িল। পাছে উহারা দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া আকাশের মেঘগুলোর দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আসন্ন বর্ষণের আগ্রহে তখন তাহারা ব্যস্তত্রস্ত হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গদের জমা করিয়া ফেলিতেছে। সেখান হইতে, আশ্বাসের কি তিরস্কারের জানিনা, একটা গুরুগম্ভীর নিনাদ ছুটিয়া আসিল, গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুম! কিশোরের চোখ দুটী দিয়া দুটী ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। সে প্রাণপণে মুখ ফিরাইয়া ওই জলভরা মেঘের মতই বসিয়া রহিল।

বেশী দূরে নয়, একখানা ছোট্ট মকাই ক্ষেতের ওপারেই নদী-চলার পথ। শ্যামার গলার স্বর খুব স্পষ্ট হইয়াই কাণে ভাসিয়া আসে, "হ্যাঁ দেখ, জল যেন নাপিয়ে নাপিয়ে ছুট্‌চে গো! উঃ কি টানরে বাবা! একবার যদি ওর মধ্যে গিয়ে কেউ পড়ে! কিসের শব্দ হলো? মাটী খসে পড়লো,—ঐ যা, অতবড় বাবলা গাছটাও শেকড় ছিঁড়ে পড়েছে দেখ ঐ মাটীর চ্যাঙ্গড়ের সঙ্গে!"

—"বন্যে না এসে দেখছি ছাড়বে না। তাই জন্যেই তো বল্‌ছি তোকে শ্যামা! মা'কে ধরে ক'রে পরশু রাতে বে-টা সেরে নিয়ে ঘরে চল। এখানে কখন যে কি হয়, তার কিছু ঠিকানা আছে?"

শ্যামা হাসিভরা চপল চোখে চাহিয়া বলিল, "আমার যেন তাতে বড্ডই অসাধ। মা বেটীর যে কি ঝোঁক চেপেছে, সেই যে কি শুভক্ষণ আছে ওর গুষ্টির পিণ্ডি দেবার জন্যে সেই একত্রিশে শ্রাবণে, সে নইলে তার মন কিছুতেই সুস্থ হবেনা। মায়ের আমার শরীরে আক্কেলটুকু একটুকুন কম।"

নিতাই ফস্ করিয়া তার চিবুক ধরিয়া একটুখানি নাড়িয়া দিল, তারপর স্থর করিয়া গাহিয়া উঠিল—

"আমার প্রেমকরা হ'ল দায় ;

ঘরে পরে বাদী সবাই, বাদী তাতে বিধাতায়।"

শ্যামা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নদীর দিকে পিছন ফিরিয়া নিতায়ের মুখের কাছে মুখ তুলিয়া সানন্দ এবং সপ্রেম কণ্ঠে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ঐ গুণেই তো তোমার পায়ে বিকিয়ে গেছি গো! এমন কথায় কথায় কবিতে কইতে বড় বড় বাবু ভায়েরাও যে পারেনা।"

"নিতাই! নিতাই! মাগো! আমি গেলুম।"—ঝপাং করিয়া একটা মস্ত বড় শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আলগা মাটীর মস্ত বড় একটা 'ধস্' ভাঙ্গিয়া লতাগুল্ম ঘাস জমির সঙ্গে শ্যামাও সেই বর্ষার জলস্রোত-তাড়িত বন্যাপ্লাবিত নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। এত অতর্কিতে এ ঘটনা ঘটিল যে নিতাই হতভম্ব হইয়া অবাক চক্ষে চাহিয়া যতক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল, তার ভিতর শ্যামাকে স্রোতের টান অনেকখানি দূরেই টানিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রাণপণে স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল নিতাই! নিতাই!

নিতাই নড়িল না। কেমন করিয়া ঐ উন্মত্ত জলস্রোতের মধ্যে সে আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিয়া দুদিনের খেয়ালের সাথীকে উদ্ধার করিতে ছুটিবে?

মানুষে পারে? সেত সহুরে ছেলে, ভালরূপ সাঁতারও জানেনা।

কিন্তু মানুষেই তা' পারিল। কিশোর দূরে থাকিয়াই শব্দটা পাইয়াছিল; চম্‌কাইয়া মুখ ফিরাইতেই আসল ব্যাপারটা এক লহমায়

ভিতর বুঝিতে পারিল। যে দিকে স্রোতের টান, সে ছিল অনেকখানি সেই দিকেই। এক মুহূর্ত্তে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ছুটিয়া গিয়া সে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামা তখনও একেবারে অবসন্ন হয় নাই,—সাঁতরাইয়া ভাসিয়া উঠিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিশোর তাকে এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া সাঁতরাইয়া তীরের দিকে টানিয়া আনিতে লাগিল। ততক্ষণে ভয়ে এবং ক্লান্তিতে শ্যামার সমস্ত দেহ গভীর অবসাদে ঢলিয়া পড়িয়াছে। "কিশোর! শেষে তুই আমায় বাঁচালি"—এই কথা বলিয়াই সে একেবারে মূর্চ্ছাবসন্ন হইয়া পড়িল। কিশোর সেই মূর্চ্ছিতা নারীকে লইয়া বহুকষ্টে কোনমতে তীরে আসিয়া যখন পৌছিল তখন তাহার শরীরে আর বড় বেশী শক্তি ছিল না।

শ্যামা যখন চোখ চাহিল, তখন দেখিল তার মুখের উপর পড়িয়া তার মা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে, ছোট ভাইটা 'দিদি, দিদি' করিয়া ডাক ছাড়িতেছে, তাদের চারিপাশে রাজ্যের লোক জড় হইয়া নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে এবং তাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিতাই অনেক ছন্দেবন্ধে অনেকখানি রসান দিয়া হাত মুখ নাড়িয়া ব্যাপারটাকে খুব জমকালো করিয়াই ব্যাখ্যা করিতেছিল। শ্যামা তা'র দিকে এক লহমার জন্য গভীর বিতৃষ্ণার সহিত চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল।

তখন তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি হঠাৎ মিলিত হইয়া গেল তার সম্মুখবর্ত্তী, অথচ অনেকখানি দূরে একান্তে অবস্থিত কিশোরের সমুৎসুক দৃষ্টির সহিত। তা'র কাপড় তখনও ভিজা, ঝাঁকড়া চুল দিয়া জল ঝরিতেছে, কিন্তু শুষ্ক শীর্ণমুখে একটা গভীর আনন্দের ছায়া যেন বর্ষাদিনের রামধনুর মতই দীপ্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্যামা স্থির অপলকনেত্রে কিছুক্ষণ তা'র মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে

উঠিয়া বসিল। তারপর নিজের দু'হাত খালি করিয়া কাঁচের চুড়িগুলি খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"কাপড়খানা বদলিয়ে দিয়ে ওকে এই সব ফিরিয়ে দে'ত মা! তাকের ওপর কাঁকুই আয়না আর তেল আছে, সেইগুলোও সব পেড়ে দিয়ে দে, আর বলে দে, ও যেন কখন আর আমার সামনে মুখ দেখাতে না আসে।

কথাটা সমবেত সকলেই শুনিতে পাইয়াছিল। একটা মুখ চাওয়া-চাওয়ির ধুম পড়িয়া গেল। নিতাই রাগে অপমানে গোঁজ হইয়া রহিল।

শ্যামা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই কিশোরকে হাতের ইসারা করিয়া কাছে ডাকিল। বিস্মিত ও স্তম্ভিতভাবে সে ধীরে ধীরে কাছে আসিলে, বিনম্র ও সলজ্জভাবে ঈষৎ স্বর নামাইয়া তাহাকে বলিল, "যাও কাপড় ছাড়গে। রান্না না করো নাই করলে, এইখানেই মায়ের কাছেই দু'টি খেয়ে নিও। কাল থেকে আমিই তোমায় রেঁধে দিতে আরম্ভ করবো—নইলে একত্রিশে আসতে আসতে তোমার দেহে আর কিছুই বাকী থাকবে না।"

কিশোর যেন কচি ছেলের মতই দুহাতে মুখটা চাপা দিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। তার বোধ হইল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে।

নিশ্চেতন মন

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সহরে কারফিউ অর্ডার জারি হইয়াছে। রাত্রি দশটা হইতে শেষ রাত্রি চারটা অবধি গৃহের বাহিরে পদার্পণ করা নিষিদ্ধ। অন্যথা, টহলদার গোরা সৈনিকের বন্দুকের গুলিতে সহসা নিহত হইলে আপত্তি করিবার কিছু থাকে না।

এরূপ অবলীলার সহিত প্রাণ হারাইবার নিদারুণ সম্ভাবনার আশঙ্কায় রাত্রি আটটা হইতেই রাজপথগুলি জনবিরল হইতে আরম্ভ করে, এবং নয়টা বাজিতে বাজিতেই জনশূন্য হইয়া যায়। সন্দেহবশে অতর্কিতে গুলি চালাইবার অধিকার যাহাদের অব্যাহত, সময়ের নির্দ্দেশ তাহারা সব সময়েই একান্ত নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিবে, অর্থাৎ কোনোদিনই সাড়ে নয়টার সময়ে সাড়ে দশটা বলিয়া ভুল করিবে না, এমন বিশ্বাস যে অধিক লোকের নাই, নয়টার পরে রাস্তা লক্ষ্য করিলে সে কথা প্রতীয়মান হয়। বহু সাবধানী লোক এক ঘণ্টাকেও যথেষ্ট নিরাপদ মার্জিন বলিয়া মনে করে না।

আমি অবশ্য ঠিক সেই অতি সাবধানীদের দলভুক্ত না হইলেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিবার একটা অস্বস্তিকর তাগিদ স্কন্ধে বহন করিয়া সন্ধ্যার পর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবারও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলাম না।

তাছাড়া সেদিন সমস্ত অপরাহ্নকাল ধরিয়া আমার বসিবার ঘরের পশ্চিম দিকের বাগানে একটা তরুণ খয়ের গাছের ডালে ডালে গোটা দুই বুলবুলি পাখীর অবিশ্রান্ত আনন্দোল্লাস নিরীক্ষণ করিয়া মনের জড়তা খানিকটা হ্রাস পাইয়া, কেমন করিয়া কোন্ দিক দিয়া, খাতা ও কলম লইয়া বসিবার একটা প্রবল বাসনা জাগিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর এক পেয়ালা কড়া চা পান করিয়া উৎসুকচিত্তে সবেমাত্র লিখিতে বসিয়াছি, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিল, একটি ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন।

মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এমন অসময়ে ভদ্রলোক দেখা করিতে আসার নিঃসংশয় পরিণাম, অন্ততঃ আজিকার মত লিখিবার আগ্রহটুকুর সম্পূর্ণ তিরোভাব। কলম বন্ধ করিয়া খাতার উপর রাখিয়া বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চেনা লোক" ?

ভৃত্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না।"

"কোথায় আছেন ?"

"সদর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে।"

ভৃত্যের হস্তে গেটের চাবি দিয়া বলিলাম, "বৈঠকখানা ঘর খুলে বসা।"

বৈদ্যনাথ ধামের আমি স্থায়ী অধিবাসী নই। বায়ু পরিবর্ত্তন অথবা তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য লইয়াও এখানে উপস্থিত হই নাই। ১৩৪৮ সালের পৌষ মাসে সহসা জাপানী বোমার ভয়ে অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হইয়া কলিকাতা নগরের উন্মত্ত নরনারী যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মাথায় হাত চাপা দিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পলাইতেছিল, আমিও সেই সময়ে

সাময়িক উত্তেজনার দাপটে খোঁটা উপড়াইয়া বৈদ্যনাথ ধামে আসিয়া হাজির হইয়াছিলাম। জনকণ্ঠকল্লোলিত নগরের জনসংখ্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, নবাগতগণের কল্যাণে তাহা পঁয়ত্রিশ হাজার বাড়িয়া গিয়াছে।

তিন চার মাস অপেক্ষা করিবার পর জাপানী বোমার বিষয়ে অবশেষে হতাশ হইয়া পঁয়ত্রিশ হাজারের মধ্যে হাজার পঁচিশেক ব্যক্তি কলিকাতায় ফিরিয়া গেল এই নূতন জ্ঞান অর্জন করিয়া যে, মানুষের জীবনে জাপানী বোমাই একমাত্র নিবার্য্য বস্তু নহে। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন ভগবান সহস্রাংশু প্রলয়ঙ্কর ক্রোধের তপ্ত নিঃশ্বাসের দ্বারা দিবসকে দগ্ধ করিয়া রজনীকে করিতে লাগিলেন অগ্নিবর্ষিণী, তখন বাকি দশ হাজার লোকও প্রায় নিঃশেষেই বাঙলা দেশে পলাইয়া গেল।

আমি কিন্তু ঘন জলদশ্যাম বর্ষার ক্ষান্তি বিমুখ অতিবর্ষণের মধ্যেও এখানে টিকিয়া আছি। স্থানীয় বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথজীর নিকট হইতে ছাড়পত্র না পাইলে কেহও বৈদ্যনাথ ছাড়িয়া যাইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু কোন্ অপরাধবশতঃ পঁয়ত্রিশ হাজারের মধ্যে কেবল আমারই পক্ষে ছাড়পত্র পাইতে এত বিলম্ব হইতেছে, তাহা বৈদ্যনাথজীর পাস্‌পোর্ট অফিসের চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারের নিকট একবার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে ইচ্ছা হয়।

যাহা হউক, যাহা অনিবার্য্য, যাহা অনতিক্রমনীয়, যাহাকে পরিবর্ত্তিত করা ইচ্ছাধীন নহে, জীবনের মধ্যে তাহাকে সহজ করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়া বৈদ্যনাথ ধামে বাস করিতেছি।

রেল-ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া ডাকঘরের পথ ধরিলে বামদিকে প্রথমেই আমাদের বাড়ির গেট। বিস্তৃত বাগানের মধ্যস্থলে গৃহ; তাহার

উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আমার বসিবার ঘর। বর্ষাদিনের অবরুদ্ধতা বশতঃ এই ঘরে বসিয়া দিবসের অধিকাংশ কাল আমার নিঃশব্দে কাটিয়া যায়। অদূরে অশথগাছের উপর অসংখ্য বকের শ্রেণী সাদা সাদা পাখা নাড়িয়া ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করে; উত্তর দিকে পুলিশ কোয়ার্টার্সের কম্পাউণ্ডে বিহারী মেয়ে-পুরুষে পুলির সাহায্যে দড়ি টানিয়া টানিয়া গভীর ইঁদারা হইতে জল তোলে; বাগানের মধ্যে রাজহংসী পুঁটি কঁ্যাক্ কঁ্যাক্ শব্দ করিয়া সমস্তদিন আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়; কোপন-স্বভাবা নন্দিনী গাভী তাহার ভয়প্রদ শিঙের তাড়নার দ্বারা পুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া রামখেলোয়ান গোয়ালা পর্য্যন্ত সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখে; উত্তর-পশ্চিম দিকের পেয়ারা গাছে হনুমানের দল কাঁচা ফল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ছেলেদের ব্যস্ত করিয়া মারে; দক্ষিণ দিকে নিকটবর্ত্তী রেলপথ দিয়া ছোট বড় নানা প্রকারের ট্রুপ ট্রেন যাতায়াত করে।

এই বৈচিত্র্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া দিন যাপন হয়ত সহজ হয়, কিন্তু ইহার বিক্ষিপ্ততায় মনের মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণা দানা বাঁধিবার সুযোগ পায় না। আজ সৌভাগ্যক্রমে লিখিবার একটা তীব্র প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল, কিন্তু হায়, বৈদ্যনাথধামে শুধু খয়ের গাছে বুল্‌বুলিই নাচেনা. গেটের সম্মুখে দুর্ব্বৃত্ত "ভদ্রলোক"ও আসিয়া দাঁড়ায়!

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা ক্যালেণ্ডারের ছবি নিরীক্ষণ করিতেছেন। বয়স ত্রিশ এবং চল্লিশের মাঝামাঝি হইবে; আকৃতি ও বেশভূষার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ বর্ত্তমান।

পদশব্দে ফিরিয়া চাহিয়া যুক্তকর উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, "নমস্কার, আপনারই নাম কি পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ?"

প্রতি-নমস্কার করিয়া আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ?"

"আমার নাম সুকুমার রায়। অনুগ্রহ ক'রে এখনি একবার আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে। বেশি দূরে নয়, খুব কাছেই।"

ভদ্রলোকের মুখে-চোখে একটা সুস্পষ্ট উৎকণ্ঠার ভাব। উৎসুকচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বলুন দেখি ?"

"আমার স্ত্রী অসুস্থ। তাঁকে দেখবার জন্যে।"

যাক্, তা হ'লে দেখছি সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। প্রসন্নচিত্তে স্মিতমুখে বলিলাম, "আপনি ভুল করেছেন মশায়, আমি ডাক্তার নই।"

সুকুমারবাবু বলিলেন, "আপনি যে এম-বি পাশ করা ডাক্তার নন, তা আমি জানি! আমার স্ত্রীর ব্যাধিও এম-বি পাশ করা ডাক্তারের এলাকার অন্তর্গত নয়।"

ঈষৎ বিপন্ন বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি তবে তাঁর ব্যাধি ?"

"উৎকট মানসিক বিকার মশায়, গভীর নিশ্চেতন মনের মধ্যে তার মূল, কিন্তু চেতন মনের মধ্যে তার ডালপালা ঠেলা মেরে আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। ব্যাপারটা যে নিতান্তই সাইকো-এনালিসিসের অন্তর্ভুক্ত তা'তে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।"

ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে বলিলাম, "কিন্তু আমি সাইকো-এ্যানালিষ্টও নই।"

বিনীত ভাবে সুকুমার বাবু বলিলেন, "মাফ করবেন আমাকে—আপনি যে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক পরেশ মুখুজ্যে তা'তে ত আর সন্দেহ নেই ?"

বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে বলিলাম, "প্রসিদ্ধ কিনা বল্‌তে পারিনে,— কিন্তু উপন্যাস যখন লিখি তখন ঔপন্যাসিক বললে আপত্তি করি কি করে।"

সুকুমার বাবু বলিলেন, "তা হ'লেই হল। ডক্টর সরকার বলেন, প্রত্যেক শক্তিশালী ঔপন্যাসিক এক একজন বিচক্ষণ সাইকো এ্যানালিষ্ট। কল্পিত নরনারীর মনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে আপনারা যখন নির্ভুলভাবে তাদের গতি নিয়ন্ত্রিত করেন, তখন একজন রক্তমাংসের মানুষ,—যে নিজের মুখে আপনাকে তার সমস্যার কথা বলবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে, তার সমস্যার সমাধান আপনি করবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। ধরুন না কেন, আপনার 'জীবনপথে' উপন্যাসের কথা। সুরেশ, নন্দিনী আর সরমার মধ্যে যে উৎকট সমস্যা ঘনিয়ে উঠল, আমরা ত' ভাবলাম কোন রকমেই তার আর মীমাংসা নেই। কিন্তু তাদের প্রত্যেককে এমন ভাবে আপনি চালিত করলেন যে, একদিন তারা তিনজনেই নিজ নিজ দিক্ দিয়ে রীতিমত সুখী হ'ল। বলুন, ঠিক বলছি কি না?"

দেখিলাম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিদায় করা আর চলিল না। ভদ্রলোককে বসাইয়া নিজে একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলাম, "আপনি একটা মস্ত বড় ভুল করছেন। কল্পিত নরনারীদের আমরা উপন্যাসে যে পথে চালিত করি তারা সেই পথেই চলে; তারা আমাদের সৃষ্ট জীব, সুতরাং আমাদের তারা অমান্য করে না। কিন্তু একজন রক্তমাংসের তৈরী মানুষের একটা স্বাধীন গতি আছে। আপনার স্ত্রী যে আমার নির্দ্দেশ করা পথে চলবেনই তার কোনো নিশ্চয়তা আছে কি?"

সুকুমার বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়তা আছে কিনা বলতে পারিনে—কিন্তু সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। কারণ আপনার কাছ থেকে পথের নির্দ্দেশ পাবার জন্যেই তিনি নিজে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার উপর অসীম শ্রদ্ধা মশায়,—অগাধ বিশ্বাস! যদি কিছু হবার হয় তা আপনার দ্বারাই হবে। বলি, ফেথ্-কিওর ব'লেও ত' একটা ব্যাপার আছে;—একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি?" তারপর আমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া সনির্ব্বন্ধে বলিলেন, "চলুন পরেশবাবু, আর ইতস্ততঃ করবেন না। আমি অতিশয় বিপন্ন।"

মনে মনে বলিলাম, আমি বোধ হয় ততোধিক বিপন্ন! দিব্য খাতা কলম লইয়া সানন্দ চিত্তে একটা সরস গল্প লিখিয়া ফেলিবার জন্য বসিয়াছিলাম, সহসা কোথা হইতে এই উৎপাত আসিয়া জুটিল! ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলাম, "দেখুন সুকুমার বাবু, হঠাৎ আমি এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারছিনে। এর জন্যে ভেবে দেখবার কিছু সময় চাই। আজ রাত্রেই আপনার সঙ্গে যাওয়া অসম্ভব।"

আমার কথা শুনিয়া সুকুমারবাবুর মুখে-চোখে একটা নৈরাশ্যের বিহ্বলতা ফুটিয়া উঠিল; আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমি বুঝতে পারছি আমার অনুরোধটা একটু অন্যায় হচ্ছে, কিন্তু আমার উপায়হীনতাও আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনি না গেলে আজ রাত্রেই হয়ত এমন একটা বিপদ ঘটতে পারে, যার প্রতিকারের কোনো উপায়ই থাকবে না। যে স্ত্রীলোক নিজের ক্যাশবাক্সের মধ্যে এক শিশি উগ্র বিষ সংগ্রহ ক'রে বসে আছে, তাকে বিশ্বাস কি বলুন?"

সুকুমার বাবুর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! জোর করে কেড়ে নেন না কেন?"

সুকুমার বাবু বলিলেন, "বিষের শিশিই না হয় জোর ক'রে কেড়ে নিলাম, প্রকাণ্ড ইঁদারাটা ত' আর হঠাৎ বুজিয়ে ফেলতে পারিনে! বলুন?"

শুনিয়া আতঙ্কে সমস্ত মনটা রী-রী করিয়া উঠিল; ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, "বলেন কি! ইঁদারা দিয়েও ভয় দেখান না কি?"

সুকুমার বাবু বলিলেন, "সর্ব্বদা; দুঃখের কথা আর বলেন কেন, মালীকে ইঁদারার কাছে চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন রাখতে হয়েছে।"

মনে মনে স্থির করিলাম, কিছুতেই এই নিরতিশয় গোলমেলে ব্যাপারে নিজেকে লিপ্ত করিব না। বলিলাম, "দেখুন মশায়, নিতান্ত বাধ্য হয়ে দেওঘরে এসেছি, আর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এখানে বাস করছি। এর ওপর যদি আবার একটা ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয় তা হ'লে জীবন দুর্ব্বহ হবে। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি এসব গোলমেলে ব্যাপারে মাথা গলাতে পারব না!"

আমার কথা শুনিয়া সুকুমারবাবু ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন; তারপর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তা যদি বলেন, তা হ'লে আপনি ইতিমধ্যেই মাথা গলিয়েছেন।"

তীক্ষ্ণস্বরে বলিলাম, "তার মানে?"

"তার মানে, ধরুন, ভবিষ্যতে যদি একান্তই কোনো ফৌজদারী মামলা বাঁধে, তা'তে হয়ত আপনাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।"

তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে বলিলাম, "কিসের সাক্ষ্য?"

"আমার স্ত্রীর জীবদ্দশায় আপনার কাছে এসে আমি নিজে তাঁর

মানসিক বিকারের কথা ব'লে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করেছিলাম, কিন্তু বহু অনুরোধ উপরোধেও আপনার সাহায্য পাওয়া যায়নি,—এই সাক্ষ্য।"

প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "ভয় দেখাচ্ছেন নাকি।"

শান্তকণ্ঠে সুকুমার রায় বলিলেন, "আজ্ঞে না, ভয় দেখাচ্ছিনে ; ভয় পাচ্ছি। একটা মিথ্যে ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে পাছে আপনি আমাদের অনুগ্রহ করতে বিরত হন, এই ভয়।" তারপর পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এ চিঠিখানা আপনাকে না দেখাবার অনুরোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখছি, না দেখালেই নয়। এ চিঠিখানা পড়লে বুঝতে পারবেন যে, এ ব্যাপারের মধ্যে আপনি মাথা দিলে ফৌজদারী মামলা দায়ের হওয়ার পরিবর্ত্তে হয়ত নিবারিতই হবে।"

মাথা গলাই, আর না-ই গলাই, চিঠিখানা পাঠ করিয়া মন খানিকটা গলিল। পরিচ্ছন্ন নারী-হস্তাক্ষরে আমার সহায়তা লাভের জন্য আকুল আবেদন,—গৃহে যাহাতে পদার্পণ করি তজ্জন্য যুক্ত-হস্ত অনুরোধ।

একি দুর্ভেদ্য রহস্যের কুজ্‌ঝটিকা! একি অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশ! চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে সুকুমার বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, "এই প্রতিভাময়ী দেবী আপনার স্ত্রী?"

স্বীকৃতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া সুকুমার বাবু বলিলেন, "আমার স্ত্রী। আপনার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা মশায়, কি বলছেন আপনি!"

সুকুমারবাবুর চক্ষে সদর্প ভঙ্গিমার দীপ্তি।

বলিলাম, "ইনি বিষ সংগ্রহ করলেন কি করে?"

সুকুমারবাবু বলিলেন, "কি জানি মশায়, কি ক'রে করলেন। লালচে কালো রঙ্ তাতে তামাটে হলদের আভা ;—দেখলে ভয় হয়! মালতী বলে, আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে ও সাদা জলে রঙ্ গোলা নকল বিষ। কিন্তু ইঁদারাটা ত' আর কাগজে আঁকা নকল ইঁদারা নয়? কি বলেন আপনি?"

সে বিষয় কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মালতীটি কে?"

"মালতী হচ্ছে বাইশ তেইশ বছরের একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে,—দেবতার আরাধনার বস্তু, কবি-কল্পনার দুর্লভ সামগ্রী!"

"আপনাদের দুজনের মধ্যে তিনি কে?"

"আমাদের দুজনের মধ্যে?" এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া সুকুমারবাবু বলিলেন, "আমাদের দুজনের মধ্যে মালতী হয়ত অশুভগ্রহ ;—কিন্তু তাই ব'লে দুষ্টগ্রহ নয়। সে নিষ্পাপ, নিরপরাধ,—তার কোনো দোষ নেই।"

"তবে তাকে অশুভ বলছেন কেন?"

"অশুভ বলছি এই জন্যে যে, আমাদের দুজনের মধ্যে তার উদয় শুভ হয়নি। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার স্ত্রীও বিশ্বাস করেন এই অশুভ হওয়ার মধ্যে মালতীর কোনও কর্ত্তৃত্ব নেই।"

"আপনার স্ত্রী তা হ'লে ঈর্ষার দ্বারা ততটা কষ্ট পাচ্ছেন না, যতটা পাচ্ছেন সংশয়ের দ্বারা?"

সুকুমার রায়ের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "ঠিক বলেছেন আপনি,—সংশয়ই হচ্ছে তাঁর প্রধান ব্যাধি। দুরন্ত সংশয়ের পীড়নে আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছি পরেশবাবু! মালতীর

সাক্ষাতে আমি যদি কথাবার্ত্তা হাসি তামাসা একটু বেশিমাত্রায় করি, তিনি মনে করেন আমার মধ্যে বিশেষ কোনো বস্তু উচ্ছল হয়েছে ; যদি মৌন অবলম্বন করি, তিনি মনে করেন সেই বস্তু প্রগাঢ় হয়েছে ; আর যদি মধ্যপথ অবলম্বন ক'রে সহজ সাধারণভাবে চলি, তিনি মনে করেন আমি সেই বস্তুকে প্রচ্ছন্ন ক'রে চলেছি। অবশ্য স্ত্রীলোক মাত্রেই অল্প-বিস্তর সংশয় পীড়িত প্রাণী ;—কিন্তু তাদের মধ্যে আবার যারা নিঃসন্তান, তাদের সংশয়ের আর কূলকিনারা নেই। সন্তানের নিগড় দিয়ে স্বামীকে কঠিনতম বাঁধনে বাঁধা যায়নি ব'লে সর্ব্বদা তাদের ভয়, স্বামী বুঝি অপরের এলাকার দিকে পদচালনা করলেন।" বলিয়া সুকুমার বাবু মৃদু হাস্য করিলেন।

যদিও বুঝিতে পারিলাম প্রতিভাময়ী সন্তানহীনা রমণী, তথাপি বলিলাম, "আপনাদের ক্ষেত্রেও কি তা হ'লে—?"

আমাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুকুমার বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের ক্ষেত্রেও সন্তানহীনতার সমস্যা,—যদিও আমার স্ত্রীর ধারণা, তার মনের মধ্যে সে সমস্যার কোনো গোলযোগ নেই। আমার বিশ্বাস, নিশ্চেতন মনের গভীর স্তরের গোলযোগ ব'লে তিনি তার অস্তিত্ব বুঝতে পারেন না। তারপর সেই গোলযোগটা উর্দ্ধগামী হ'য়ে অবচেতন মন থেকে একটা প্রতীক অবলম্বন ক'রে যখন চেতন মনে এসে সন্দেহে রূপায়িত হয়, তখন তাঁর মনে হয় গোলযোগের যা কিছু তা তাঁর স্বামীর নিশ্চেতন মনের মধ্যেই আছে।"

মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "সাইকো-এ্যানালিসিসের ব্যাপারে আপনিও দেখ্‌ছি পণ্ডিত মানুষ,—তবে আমার কাছে এসেছেন কিসের জন্যে ?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সুকুমারবাবু বলিলেন, "কিছু না, কিছু না। এ হচ্ছে পুঁটি মাছের ফরফরানি, গণ্ডূষ-জল-মাত্রেন সফরী ফরফরায়তে। আর আপনি হচ্ছেন, অগাধ জল সঞ্চারী রুই মাছ। তা ছাড়া পরেশবাবু আমার ডিস্পেন্সারীর ওষুধে আমার স্ত্রীর উপকার হবেনা, তা সে ওষুধ ভালো হলেও।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মালতীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কি? আর কেমন ক'রেই বা তিনি আপনাদের মধ্যে এলেন?"

এই প্রশ্নটাই পূর্ব্বে একবার করিয়াছিলাম, কিন্তু সুকুমারবাবু তখন বাগাড়ম্বরের কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছিলেন। এবারও হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করবেন পরেশবাবু, আপনার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে এমন অনেক কথা ব'লে ফেলেছি যা হয়ত আমার পক্ষে বলা উচিত হয়নি। আমার মুখে বিস্তারিত ভাবে কথা শুনে পাছে আপনার মধ্যে পক্ষপাত এসে পড়ে সেইজন্যে বিশেষ ক'রে মালতীর কথাই আপনাকে বেশি কিছু বলতে নিষেধ ছিল, কারণ মালতীই হচ্ছে এই গোলযোগের কেন্দ্র। আমার স্ত্রী নিজের হাতে একটা পূর্ব্বকথা লিখে রেখেছেন যেটাকে ভিত্তি ক'রে আপনাকে আপনার নির্দ্দেশ গড়ে তুলতে হবে।"

বলিলাম, "কিন্তু মালতীর কথা আপনি আমাকে নিতান্ত কমও বলেন নি।"

"তার কারণ, আমাদের দুজনের মধ্যে প'ড়ে মালতী বেচারা অকারণ কষ্ট পাচ্ছে ব'লে তার প্রতি হয়ত আমার একটু সমবেদনা আছে। ক'দিন ধ'রে সে একটা হিষ্টিরিক্ অবস্থার মধ্যে রয়েছে। আজ দেখে এসেছি তীব্র মাথাধরায় ছট্‌ফট্ করছে। তার বিছানার পাশে আপনাকে যখন নিয়ে যাব তখন তাকে দেখে

আপনার মনে হবে যেন একরাশ মালতী ফুল বসন্তের হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে !"

মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, শুধু মনোবিশ্লেষণই নয়, কবিত্বও প্রচুর আছে দেখ্ছি ! কাহার নিশ্চেতন মনের মধ্যে অবরুদ্ধ প্রবৃত্তির গোলযোগ বর্ত্তমান,—স্ত্রীর, না স্বামীর,—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের উদয় হইল। ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, "রাত প্রায় আটটা বাজে। দশটা থেকে কিন্তু কারফিউ অর্ডার।"

সুকুমারবাবু বলিলেন, "কোনো চিন্তা নেই, সাড়ে নটার মধ্যে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। আর একান্তই যদি দেরি হ'য়ে যায়, সামনে লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে আপনাকে নিয়ে এলেই হবে।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে কেন ?"

"রাত্রি দশটার পর ডাক্তার আনতে হ'লে বা পৌঁছে দিতে হ'লে লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে যেতে হয়। ডাক্তারের কথা শুনলে আর কিছু বলে না।"

"কতদূরে আপনাদের বাড়ী ?"

"খুব কাছে। রেলওয়ে লেভ্ল্ ক্রসিং পেরিয়ে মিনিট দশেকের পথ। এই কার্স্টেয়ার্স টাউনেই মহেশবাবুর বাড়ী, কোব্রা হাউস।"

বাড়ীটার নাম যেন মনে পড়িল। বসন্তসমীরণে মালতী ফুলের আলোড়ন দেখিবার বাসনা আমার নিজের অবচেতন মনে বাসা বাঁধিয়াছে কি না, তাহাও বোধ হয় বিশ্লেষণের যোগ্য। বলিলাম, অপেক্ষা করুন, প্রস্তুত হ'য়ে আসছি।"

কোব্রা হাউসে উপস্থিত হইয়া স্থকুমারবাবু আমাকে সাদরে বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

বারান্দায় একজন চাকর দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায় রে চৈতা?"

চৈতা বলিল, "পাশের বাড়ীর মাইজি বেড়াতে এসেছেন, মা তাঁর সঙ্গে গল্প করছেন। আপনারা এলে খবর দিতে বলেছেন।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া স্থকুমারবাবু বলিলেন, আচ্ছা, মিনিট দশ পনেরো পরে খবর দিস্। এখন তুই কাজে যা।" চৈতা প্রস্থান করিলে বলিলেন, "চলুন পরেশবাবু, এবার আমরা মালতীকে দেখে আসি।"

বারান্দা দিয়া খানিকটা গিয়া দুইটি ঘর অতিক্রম করিয়া মালতীর ঘরে প্রবেশ করিলাম। পাশের ঘর হইতে আগত স্তিমিত আলোকে মনে হইল, কে যেন পালঙ্কের উপর পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়া আছে।

স্থকুমার বাবু স্থইচ্‌টা টিপিয়া দিতেই বোধ হয় উজ্জল আলোকে মালতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। "কে" বলিয়া পাশ ফিরিতেই দেখিলাম, সত্যই একরাশ মালতী ফুলের আলোড়ন! কবি-কল্পনার সামগ্রী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মালতীর মাথায় একটা সাদা রুমাল বাঁধা।

স্থকুমার বাবু বলিলেন, "পরেশবাবু এসেছেন, মালতী।"

সাগ্রহকণ্ঠে "ও!" বলিয়া তাড়াতাড়ি রুমালটা খুলিয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িতে উদ্যত হইল।

ব্যস্ত হইয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলাম, "নাব্‌বেন না, নাব্‌বেন না! শুয়ে থাকুন।"

ততক্ষণে মালতী নামিয়া পড়িয়া নত হইয়া আমার পাদস্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে আপনি 'আপনি' বলবেন না।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তা না হয় বলব না; কিন্তু ছুটো কাজই অন্যায় হ'ল,—প্রথমতঃ, অসুস্থ শরীরে উঠে দাঁড়ানো; আর দ্বিতীয়তঃ, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা।"

কোন কথা না বলিয়া মালতী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

সুকুমারবাবু বলিলেন, "প্রথমটা হয়ত অন্যায় হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়টা নিশ্চয়ই হয়নি।" মালতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আতুরে নিয়মো নাস্তি,—তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না, বোসো।"

মালতী উপবেশন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাথাধরা এখন কেমন আছে?"

মালতী বলিল, "একটু কমেছে।"

মালতীর কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া সুকুমার বাবু বলিলেন, "ওটা মেয়েদের বাঁধি গৎ, কখনও যদি তারা বললে, একটু বেড়েছে।" তারপর শয্যা হইতে রুমালটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "ভালো ক'রে বেঁধে দেবো?"

স্মিত মুখে সুকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু কণ্ঠে মালতী বলিল, "থাক, আমি বেঁধে নোবো অখন।"

"তা হ'লেই বোঝা গেছে কত কমেছে"—বলিয়া সুকুমারবাবু রুমালটা ভালো করিয়া পাট করিয়া মালতীর মাথায় বাঁধিয়া দিলেন।

মালতীর মুখে একটা নিঃশব্দ সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম, সাদা রুমালের ন্যায় একটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুও মূল্যবান

অলঙ্কারে পরিণত হইয়া সুন্দরী রমণীর দেহের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুকুমারবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, "এবার তা হ'লে তুমি শুয়ে প'ড়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর। পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ ভবিষ্যতে অনেক হবে। এখন আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসি। কেমন?"

মৃদু স্বরে মালতী বলিল, "আচ্ছা।" সুইচ্ তুলিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া আমরা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিবার মিনিট দুই তিন পরেই প্রতিভাময়ী ঘরে প্রবেশ করিলেন। যৌবনের সীমান্ত দেশে উপনীত নিটোল সুসম্বদ্ধ নহে। মুখে চখে স্বচ্ছ অনাবিল হাস্যের মধ্যে অন্তরের সরলতা প্রতিফলিত। সহাস্যমুখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

পাদস্পর্শ করিবার জন্য এবার আমি প্রবলতর আপত্তি করিলাম।

প্রতিভাময়ী বলিলেন, "ওরে বাস্‌রে! বহু সৌভাগ্যে বাড়ীতে পদধূলি পড়েছে, তা থেকে কখনো বঞ্চিত হ'তে আছে!"

আমি বলিলাম, "আমি কিন্তু গুরুও নই, গুরুজনও নই। লঘুজন হ'য়ে প্রাপ্যের অধিক গুরু বস্তু লাভ করতে কুণ্ঠাবোধ করি।"

স্মিত মুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রতিভাময়ী বলিলেন, "না, না, কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই। আমাকে যখন আপনি সম্পূর্ণভাবে জানবেন তখন বুঝতে পারবেন, আপনাকে আমার গুরুজন ব'লে মনে করলে একটুও অন্যায় হয় না। তাছাড়া, যাঁর লেখা থেকে জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে পেরেছি, যাঁর লেখার সাহায্যে সঙ্কটকালে শুভ পথের সন্ধান পাব ব'লে বিশ্বাস করি, তিনি গুরু নন ত' কি?"

"আর সেই সঙ্কটকাল কি ভাবে এবং কাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে তার সন্ধান পাবেন এই কয়টি পাতার মধ্যে।" বলিয়া স্থকুমারবাবু উঠিয়া গিয়া একটি দেরাজ হইতে একত্রে গ্রথিত কয়েকটি লিখিত পাতা আনিয়া আমাকে দিলেন।

লেখাটুকু ধীরে ধীরে পড়িয়া শেষ করিলাম। সমস্যা যে বিশেষ জটিল অথবা গুরুতর তাহা নহে; তবে যে রহস্যজালে মালতীমালা জড়িত, তাহা অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপক। মালতীকে আশ্রয় করিয়া আমার মনের মধ্যে একটা বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা জাগিল।

প্রতিভাময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, "অঙ্কুরটি ত' বেশ ভালই দেখলাম; কিন্তু আমাকে কি ক'রতে হবে? পাতা ধরাতে হবে? ফুল ফোটাতে হবে? ফল ফলাতে হবে?"

উৎফুল্লমুখে প্রতিভাময়ী বলিলেন, "ঠিক তাই। তবে এটাকে অঙ্কুর ব'লেও ধরবেন না। এটাকে মনে করবেন বীজ, মাটির নীচেই একে রাখবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ভুলে গিয়ে, সহজভাবে আপনি লিখে যাবেন,—যেভাবে লিখেছিলেন আপনার 'আদি ও অন্ত', কিম্বা 'প্রথম দিনে'। আমার বিশ্বাস, তা হ'লে নিশ্চয় আমি সে লেখার মধ্যে আমার পথের সন্ধান খুঁজে পাব।"

মনে মনে বলিলাম, "কেমন ক'রে যে পাবেন, তা কিন্তু আমি একটুও বুঝতে পারছিনে!" ভাবিলাম, কত রকমের পাগল আছে, প্রতিভাময়ীও হয় ত' বা এক রকমের পাগল! প্রকাশ্যে বলিলাম, "খুঁজে যদি পান তা হ'লে আমি খুবই স্থখী হব, কিন্তু উপস্থিত আপনার বিরুদ্ধে আমার একটা অনুযোগ আছে।"

সকৌতূহলে প্রতিভাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অনুযোগ?"

"আচ্ছা, ক্যাশবাক্সের মধ্যে এক শিশি বিষ ভ'রে রেখে আপনার স্বামীকে ভয় দেখাচ্ছেন'• কেন, বলুন ত ?"

আমার কথা শুনিয়া প্রতিভাময়ীর মুখে হাসি দেখা দিল ; বলিলেন, "সে কথা শুনতেও বাকি নেই দেখছি!" তাহার পর ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "তা হ'লে উনিও ওঁর দেরাজের মধ্যে একটা পাঁচনলা রিভলভার ভ'রে রেখে ওঁর স্ত্রীকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন, তা জিজ্ঞাসা করুন।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কি বিপদ! উনিও রিভলভার রেখেছেন না কি ?"

প্রতিভাময়ী বলিলেন, "রেখেছেন বই কি। কোন্ এক বন্ধুর বাড়ী থেকে রিভলভার এনে পাঁচটি নলেই টোটা পুরে রেখেছেন। মালতী বলে, ও আসল রিভলভার নয়, ছেলেদের টয়-রিভলভার। ভগবান জানেন, আসল না টয়!"

মালতীর উপর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল ;— প্রতিভাময়ীর বিষকে সে বলে নকল বিষ, আর স্বকুমারের রিভলভারকে বলে টয়-রিভলভার! দুইজনের মধ্যে সে সাঙ্ঘাতিকভাবে নিরপেক্ষ। ধন্য মালতীমালা!

স্বকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, "আপনিও তা হ'লে স্বকুমার বাবু ?"

মৃদু হাসিয়া স্বকুমার বাবু বলিলেন, "কি করি বলুন,—একটা counter check ত' দেওয়া দরকার।"

বলিলাম, "কিন্তু তাই ব'লে একেবারে পাঁচনলা রিভলভার ?"

প্রতিভাময়ী বলিলেন, "শুধু কি রিভলভারই ? মাঝে মাঝে আবার

যুদ্ধে যোগ দেবেন ব'লে ভয় দেখিয়ে দরখাস্ত লিখতে বসেন। রিভলভারটা না হয় টয়-রিভলভারই হলো, যুদ্ধটা ত' আর খেলার যুদ্ধ নয়।"

বুঝিলাম, যুদ্ধে যোগ দেওয়াটা ইঁদারায় ঝাঁপ দেওয়ার counter check।

বলিলাম, "আপনার দিকেও যে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার মতো একটা জিনিষ আছে।"

সকৌতূহলে প্রতিভাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জিনিষ ?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিলাম, "ইঁদারায় ঝাঁপ দেওয়া ?"

পূর্ব্ববারের অনমুরূপ, এবার প্রতিভাময়ীর মুখে একটা বিরক্তির ছায়া ফুটিয়া উঠিল। স্কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "না, না, এ সব তুচ্ছ কথাগুলো পরেশবাবুকে ব'লে তুমি কিন্তু ভাল করনি !" তারপর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি কিন্তু, পরেশবাবু, আমরা বললাম বলেই এ জিনিষগুলো আপনার লেখার মধ্যে ঢুকিয়ে লেখাকে হাল্কা করবেন না।"

অল্প হাসিয়া বলিলাম, "কলমের মুখ দিয়ে কোন্ জিনিষ লেখার মধ্যে ঢুকবে অথবা ঢুকবেনা, তা আগে থেকে বলা কঠিন।"

একজন চাকর আসিয়া মৃদুস্বরে প্রতিভাময়ীকে কি বলিল। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া প্রতিভাময়ী বলিলেন, "চলুন পরেশবাবু, একবার ভিতরে চলুন।"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "কেন বলুন দেখি ?"

"একটু দরকার আছে"—বলিয়া প্রতিভাময়ী অগ্রসর হইলেন।

সুকুমারের প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলাম।

সুকুমার বাবু বলিলেন, "মনে হচ্ছে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে!"

ভিতরে গিয়া দেখি আহার কক্ষে টেবিলের উপর দুইজনের জন্য প্রচুর আয়োজন। যথেষ্ট আপত্তি করিলাম, কিন্তু অব্যাহতি পাইলাম না। প্রতিভাময়ীর নিরবচ্ছিন্ন যত্ন এবং অবধানের মধ্যে সুকুমার বাবুর সহিত আহার শেষ করিয়া যখন বাহিরে আসিলাম তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। দশটা হইতে কার্‌ফিউ অর্ডার। আর অপেক্ষা না করিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলাম।

নত হইয়া প্রণাম করিয়া প্রতিভাময়ী আমার হাতে একটা বন্ধ করা পুরু নীলাভ খাম দিলেন।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "এ আবার কি?"

যুক্ত-করে স্মিত মুখে প্রতিভাময়ী বলিলেন, "গুরুদক্ষিণা।"

তাড়াতাড়ি খাম খুলিয়া দেখি দুইখানা দশটাকার ও একখানা পাঁচ টাকার নোট।

সত্য সত্যই বিরক্ত হইলাম। খাম ও নোটগুলা পার্শ্ববর্ত্তী টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলাম, "এ আপনাদের কি ছেলেমানুষি বলুন ত?"

প্রতিভাময়ী উত্তর দিলেন নিঃশব্দ যুক্ত-করে। তাঁহার ভাষার চেয়ে মিনতিপূর্ণ মৌন অধিক অর্থময়।

নোটগুলা খামের মধ্যে ভরিয়া জোর করিয়া আমার পকেটে ঢুকাইয়া দিয়া সুকুমার বাবু বলিলেন, "গুরুদক্ষিণায় যদি আপত্তি থাকে ত' রোগদণ্ড ব'লে গ্রহণ করুন। রোগদণ্ড না দিলে চিকিৎসকের ব্যবস্থায় উপকার হয় না।" তাহার পর প্রায় ঠেলিতে ঠেলিতে আমাকে বারান্দায়

লইয়া আসিয়া বলিলেন, "আর দেরি ক'রে কাজ নেই, চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।"

আমি কিন্তু তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলাম না। বলিলাম, "পৌছে দিয়ে ফিরে আসবার মতো যথেষ্ট সময় নেই। আমার কাছে টর্চ আছে, অনায়াসে চ'লে যেতে পারব।"

সুকুমার বাবু আর পীড়াপীড়ি করিলেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যবস্থাপত্র কবে আশা করতে পারি?"

দিন তিনেকের মধ্যে পাঠাইয়া দিবার আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলাম।

পরদিন সকালে চা পান করিয়া প্রতিভাময়ীর লিখিত বীজলিপিটুকু লইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি খয়ের গাছে পূর্ব্বদিনের সেই বুলবুলি পাখী দুইটা আসিয়া জুটিয়াছে। বোধ হয় ঐখানেই বাসা বাঁধিবার মৎলব। মনটা খুসিতে ভরিয়া উঠিল।

সেই খুসির আলোকে সহসা আবির্ভূত হইল মাথায় রুমাল বাঁধা মালতীমালার মূর্ত্তি। পরক্ষণেই দেখি একটা নিবিড় আকর্ষণে হাতের ফাউণ্টেন্ পেন খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

তাহার পর দেখিতে দেখিতে প্রতিভাময়ীর বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইল, পাতা গজাইল, ফুল ফুটিল, এবং দ্বিতীয় দিনে ফল ফলিয়া অবশেষে পরিসমাপ্তি ঘটিল। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রসন্ন হইয়া দেখিলাম একটা রীতিমত সাহিত্যিক গল্প রচিত হইয়াছে। অসন্ধানী

পাঠকের সাধ্য কি যে বুঝিতে পারে, এই গল্পে লৌকিক জগতের তিনটি রক্তমাংসের প্রাণীর জীবনের বাস্তবতা স্পন্দিত আছে।

প্রতিভাময়ী ইহার মধ্যে তাঁহার সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইবেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু গল্পের প্রতিভাময়ী যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার গভীর নিশ্চেতন মনের জটিলতা উন্মোচনে সমর্থ হইয়াছিল, তিনি যদি সেই ইঙ্গিত ধরিতে পারিয়া নিজেকে তদনুযায়ী চালিত করেন, তাহা হইলে মালতী তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সহজ হইবে, সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

লেখাটা খামে ভরিয়া প্রতিভাময়ীর নামে ঠিকানা লিখিয়া সেই কোব্রা হাউসে পাঠাইয়া দিলাম।

ঘণ্টা দুই পরে সুকুমার বাবুর চাকর আসিয়া একটা চিঠি দিয়া গেল। খাম খুলিয়া দেখি প্রতিভাময়ী এবং সুকুমার বাবু উভয়েই চিঠি লিখিয়াছেন।

চিঠির একটা অংশে প্রতিভাময়ী লিখিয়াছেন, যাহা দিয়াছেন তাহা প্রত্যাশারও অধিক। আমার সামান্য বীজ হইতে এমন অদ্ভুত ফল, পুষ্পময়ী লতা উৎপন্ন হইবে তাহা জানিতাম না। গল্পের প্রতিভাময়ীর মধ্যে যে শুভ বুদ্ধির বিকাশ এবং বিবেচনাশক্তির লীলা দেখাইয়াছেন, আমার নিজের মধ্যে সেরূপ অংশতঃ দেখা দিলেও ধন্য মনে করিব। মালতীকে যাহা আপনি করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মালতী হইতে ইচ্ছা হয়।

সুকুমার বাবু লিখিয়াছেন, অদ্ভুত আপনার ব্যবস্থাপত্র! প্রতিভাময়ীর বিষের শিশি আর আমার রিভলভার দুইই বোধ হয় এখন নির্ভয়ে মালতীর হাতে গচ্ছিত রাখা যায়। আর মালতীকে যাহা আপনি

করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আপনার গল্পের প্রভাস হইতে লোভ হয়! আপনার গল্প পড়া শেষ হইলে মালতীর মুখের যে শোভা হইয়াছিল তাহা দেখিলে আপনি খুসি হইতেন।

না দেখিয়াও খুসি হইলাম।

কিন্তু দিন দশেক পরে একদিন সকাল বেলা মালতীকে সশরীরে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আরও বেশি খুসি হইলাম। সুকুমার বাবু তাঁহার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে শীঘ্রই দেখা করিবেন; কিন্তু এই দিন দশেকের মধ্যে তাঁহাদের কাহারও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই।

আমাদের পূর্ব্বদিকের গেটের কাছে একটা কলকে ফুলের গাছ আছে। তাহার ফুলের রঙ্-ফলানোর মধ্যে এমন একটা বৈচিত্র্য, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। কলকে ফুলের হলদে রঙের মধ্যভাগে চাঁপা ফুলের লাল্‌চে আভা কিরূপে আসিল, গোটা দুই ফুল হাতে লইয়া মনে মনে তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি একটি সুদর্শন যুবকের সহিত মালতীমালা গেট ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেছে। মালতীর মুখে নিঃশব্দ আল্‌গা হাসি।

আমি দুই চার পা আগাইয়া যাইতেই মালতী ও যুবকটি তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল।

সহাস্য মুখে বলিলাম, "কি খবর মালতী? তোমরা সকলে ভাল আছ ত?"

স্মিতমুখে মালতী বলিল, "আছি। কিন্তু আমি মালতী নই।"

সবিস্ময়ে বলিলাম, "তুমি মালতী নও? তবে কে তুমি?"

"আমি মল্লিকা"—বলিয়া মালতী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

গভীরতর বিস্ময়ে বলিলাম, "তোমার নাম মালতীমালা নয়?"

মালতী বলিল, "আজ্ঞে না, আমার নাম মল্লিকাবালা।"

কি বলে মালতী! এ কি নূতন প্রহেলিকার সৃষ্টি করিতে চাহে সে! তবে কি এই নারী মালতীর প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব? তাহার যমজ ভগ্নী?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মালতীমালা কে?"

হাসিমুখে মালতী উত্তর দিল, "মালতীমালা এ জগতের কেউ নয়। সে আপনার 'নিশ্চেতন মন' গল্পের প্রধান নায়িকা।"

যে লেখাটা লিখিয়া দিয়াছিলাম, গল্প হিসাবে তাহার কোনো নামকরণই করি নাই। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমার 'নিশ্চেতন মন' গল্প? তার মানে?"

করজোড়ে মালতী বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, তার মানে বলবার অধিকার আমার নেই। শ্রীকুমার বাবু এখনি এসে সব কথা আপনাকে বলবেন।"

"শ্রীকুমার বাবু? শ্রীকুমারবাবু আবার কে?"

"যাঁকে আপনি সুকুমারবাবু ব'লে জানেন।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আর, যাঁকে আমি প্রতিভাময়ী ব'লে জানি?"

"তিনি প্রভাময়ী।"

"এ সব কথার মানেও কি, ঐ যাঁর নাম বল্লেন শ্রীকুমারবাবু, তিনি এসে বলবেন?"

মালতীর মুখে ক্ষীণ হাসিটুকু লাগিয়াই ছিল, বলিল, "হ্যাঁ। বেশি দেরী হবেনা, প্রভাময়ীর সঙ্গে ডাকঘর থেকে চিঠি আনতে গেছেন তিনি। দু' চার মিনিট এখানে দাঁড়ালেই তাঁরা এসে পড়বেন।"

বিস্ময়ের উত্তেজনায় এতক্ষণ যুবকটির পরিচয় লইবার কথা মনে ছিল না; তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া মালতীকে বলিলাম, "এর পরিচয় ত' দাওনি; ইনি কে?"

"ইনি? ইনি—ইনি—" দেখিলাম মালতীর মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

মালতীর সঙ্কটাবস্থা দেখিয়া যুবকটি স্মিতমুখে বলিল, "আমি হচ্ছি আপনার 'নিশ্চেতন মন' গল্পের প্রভাস; আমার চলিত নাম বিজয়।"

প্রভাস নামের সূত্র ধরিয়া 'নিশ্চেতন মন' গল্পের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। নিশ্চেতন মন সংক্রান্ত কাহিনী বলিয়া ঐ নামেই তাহা হইলে ইহারা আমার নামহীন লেখার উল্লেখ করিতেছে। খুসি হইয়া বলিলাম, "তুমি প্রভাস? আরে তা হ'লে যে তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি।"

বিজয় বলিল, "প্রভাস হিসেবে ভাগ্যবান ব্যক্তি তা'তে সন্দেহ নেই; কিন্তু বিজয় হিসেবে ভাগ্যবান হ'তে এখনো বিলম্ব আছে।"

প্রসন্নকণ্ঠে বলিলাম, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি, বিজয় হিসেবেও তোমার 'বিলম্ব' অতি শীঘ্রই অবিলম্ব হোক।" মালতীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এ আশীর্ব্বাদ তোমার পছন্দ হয় মালতী?"

মালতীর মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বোধ হয় প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে আমার হাতের দিকে চাহিয়া বলিল, "কলকে ফুল নাকি? ভারি চমৎকার রঙ্ ত?"

বলিলাম, "ভারি চমৎকার রঙ।" দুজনের হাতে দুইটি ফুল দিয়া বলিলাম, "কলকে ফুলের হলদে রঙের মধ্যে চাঁপা ফুলের লালচে আভা।"

মালতী বলিল, "সত্যি। আশ্চর্য্য ত!"

বলিলাম, "সেই আশ্চর্য্যই তন্ময় হ'য়ে দেখছিলাম, কিন্তু পরমাশ্চর্য্য যে আসন্ন হ'য়ে এসেছে তখন কে তা জানত!"

বিস্মিত হইয়া মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরমাশ্চর্য্য?"

"মালতী ফুলের মল্লিকা হ'য়ে আসা।"

মালতী ও বিজয় সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই গেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মালতী বলিল, "ঐ ওঁরা এসেছেন।"

চাহিয়া দেখি সুকুমার বাবু এবং প্রতিভাময়ী গেট ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেছেন। দূর হইতে যুক্তকর উত্তোলিত করিয়া সুকুমার বাবু বলিলেন, "নমস্কার পরেশদাদা।"

আমিও যুক্তকর উত্তোলিত করিয়া বলিলাম, "নমস্কার! কিন্তু কাকে নমস্কার? সুকুমারকে, না শ্রীকুমারকে?"

একটা উচ্চ হাস্যে শরৎকালের শান্ত প্রভাত চকিত হইয়া উঠিল।

প্রতিভাময়ী নিকটে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাসন্তীদিদির সঙ্গে দেখা করতে এলাম জামাইবাবু।"

আমার স্ত্রীর নাম বাসন্তী।

বলিলাম, "খুব ভাল কথা, কিন্তু তার আগে জানতে চাই আশ্চর্য্যের তালিকা এখানেই শেষ হ'ল, না এখনও কিছু বাকি আছে।"

"কিছু বাকি আছে"—বলিয়া সুকুমার আমার হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল দিলেন।

খুলিয়া দেখি ছাপাখানার প্রুফ। প্রথম স্লিপের উপরে শিরোনামায় বড় অক্ষরে ছাপা, "নিশ্চেতন মন," তাহার নিম্নে লেখকের নাম

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিলাম আমার নূতন লেখাটাই বটে।

স্লিপ্‌গুলা গুছাইতে আরম্ভ করিতেই সুকুমার বাবু আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজিয়া দিলেন। খুলিয়া দেখি 'ভারতলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হরেন চাটুয্যের চিঠি। হরেনবাবু লিখিয়াছেন :—

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

'নিশ্চেতন মন' নামক আপনার অতি উৎকৃষ্ট গল্পটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদিও এই ধন্যবাদের অনেকখানি অংশ বন্ধুবর শ্রীকুমারের প্রাপ্য, কারণ ছল এবং কৌশলের প্রয়োগের দ্বারা সে এই গল্পটি আপনাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া আমাকে পাঠাইয়াছে। এজন্য তাহার উপর আপনি বিরক্ত হইবেন না, কারণ আপনার ন্যায় অলস ব্যক্তির নিকট হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে সহজে পূজা সংখ্যার জন্য গল্প আদায় করা সহজ হইবে না জানাইয়াছিলাম বলিয়াই সে তাহার স্ত্রী প্রভাময়ী এবং শ্যালিকা মল্লিকার সহায়তায় এই উপায় অবলম্বন করিয়াছ। তাহা ছাড়া, সম্পর্ক হিসাবেও সে আপনার উপর কৌশল প্রয়োগ করিতে পারে। আপনি হয়ত জানেন না, শ্রীকুমার সম্পর্কে আপনার ভায়রাভাই, যদিও দূর সম্পর্কে।

প্রভাময়ীর পিতা স্বর্গীয় অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার দূর সম্পর্কীয় পিস শ্বশুর হইতেন। পাঞ্জাব সেক্রেটারিয়েটে তিনি একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং বাঙ্‌লা দেশের সহিত সম্পর্ক একরকম বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই দেশেই বাস করিতেন। প্রভাময়ীর বিবাহও তিনি দিয়াছিলেন সেইরূপ পাঞ্জাব নিবাসী এক বাঙালী পরিবারে। এই উভয় পরিবারেই বাঙলাদেশে বিশেষ যাতায়াত ছিল না বলিয়া এ পর্য্যন্ত

শ্রীকুমারদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটে নাই। তাহারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া অভিনব উপায়ে তাহারা যুগপৎ আপনার সহিত পরিচয় স্থাপন এবং আমার একটি উপকার সাধন করিয়াছে।

শ্রীকুমার লাহোরে ব্যারিষ্টারী করে, বহুদিন পরে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিতেছিল। পথে বৈদ্যনাথে তীর্থ করিতে গিয়া রেল বন্ধ হওয়ায় আটকাইয়া পড়িয়াছে। বৈদ্যনাথ হইতে আমাকে সে চিঠি লেখে। আমি জানি আপনি সপরিবারে বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন। সুযোগ বুঝিয়া গল্প আদায় করিবার জন্য শ্রীকুমারের উপর ভার দিই।

আপনার গল্পের দক্ষিণা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইয়াছি,—কিন্তু গল্পটি আমার বিশেষ ভাল লাগায় মনে করিতেছি আরও কিছু পাঠাইয়া দিব।

প্রুফটি শীঘ্র দেখিয়া পাঠাইবেন। আশা করি শারিরীক কুশলে আছেন। ইতি—

নমস্কারান্তে

শ্রীহরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

চিঠি পড়া শেষ হইলে একটা উচ্চ হাস্যরব উত্থিত হইল।

আমি বলিলাম, "এ যে দেখছি আমার বিরুদ্ধে রীতিমত ষড়যন্ত্র!"

শ্রীকুমার হাত জোড় করিয়া বলিল, "দাদা, অপরাধ যদি হ'য়ে থাকে অনুগ্রহ ক'রে দণ্ডবিধান করুন!"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দণ্ডবিধান ত' করতেই হবে। তবে আমি ফরিয়াদী হ'য়ে দণ্ড দিতে পারিনে। চল, তোমাদের বাসন্তীর এজলাসে নিয়ে গিয়ে আজ সমস্ত দিনের মত অপরাধীদের এ বাড়িতে বন্দী করবার জন্যে প্রার্থনা জানাই।"

দেখিলাম দণ্ডের বিবরণ শুনিয়া অপরাধীদের মুখ উল্লসিত হইয়াছে।

মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, "একমাত্র তোমার প্রতি আমি নিজেই আর একটা দণ্ডবিধান করলাম মালতী।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দণ্ড?"

"তোমার মল্লিকা নাম আমি অস্বীকার করলাম। চিরদিন তোমাকে 'মালতী' ব'লে ডেকে এ ঘটনার আনন্দময় স্মৃতি মনের মধ্যে সজাগ রাখব।"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে মালতী বলিল, "এ দণ্ড আমি মাথা পেতে নিলাম জামাইবাবু!

অপরাধীদের লইয়া প্রসন্নচিত্তে আদালত অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

দুর্ঘটনার জের

নরেন দেব

রাসবিহারী এ্যাভেন্যু।

দক্ষিণে হিন্দুস্থান পার্কের একটা শাখা এসে মিশেছে।......বাঁয়ে এসে মিশেছে ডোভার লেনের একটা শাখাপথ। এরই মাঝামাঝি এক জায়গায় ট্রামের ষ্টপেজ।

একটি ছেলে হিন্দুস্থান পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার অস্থির পদচারণা ও ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি দেখে কোথাও যাবার যে বেশ তাড়া রয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। গড়িয়াহাটার মোড়ের দিকে বার বার চেয়ে দেখছিল যে বাস আসছে কিনা?

কিন্তু বাস এলনা। এল একটি তরুণী। ওপারের ডোভার লেন থেকে বেরিয়ে। দাঁড়াল ট্রাম ষ্টপেজে এসে। দেখতে মন্দ নয়। ছিপ্ছিপে গড়ন। রং ফর্সা বলা চলে। চশমা পরা চখের ভিতর যেন একটা বুদ্ধির দীপ্তি উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে।

ছেলেটি মুহূর্ত্তের জন্য চেয়ে দেখলে মেয়েটির দিকে। মেয়েটি কিন্তু তাকে দেখতেই পেলে না। সে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটির দিকে পিছন ফিরে লাইনের ধারে ট্রাম ষ্টপেজের পাথরে বাঁধা খালি জায়গাটুকুতে।

ডালি

ছেলেটি ছিল ফুটপাথের ধারেই। বাস চলার রাস্তায়। পিছন থেকে যতটা দেখা যায় তাতেই ছেলেটির মনে ধারণা হ'ল—মেয়েটি সহজ প্রসাধনের আর্ট জানে। ফিগারটি যে তার ভাল'এ সম্বন্ধে সে সচেতন! নইলে···সাড়ী অত দেহের সঙ্গে সেটে পরবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। হাতে কিছু বইখাতা। কলেজে পড়ে বোধ হয়।

ছেলেটির এই আনন্দপ্রদ 'ফিজিয়োনমি' অনুশীলনে কিন্তু বাধা পড়ল।

সামনে এসে দাঁড়াল আর একটি স্ত্রীলোক! ছিন্ন মলিন বসনে লজ্জা নিবারণ সম্পূর্ণ হচ্ছেনা বলে যেন সে নিরতিশয় কুণ্ঠিত! কোলে একটি অল্পদিনের শীর্ণ শিশু।

স্ত্রীলোকটি হাত পাতলে। কিন্তু ঠিক ভিখারিণীর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে নয়। মুখে তার দুঃখকষ্টের ছায়া গভীর হয়েই পড়েছে; কিন্তু ভিক্ষুকের ছাপ সে মুখে নেই।

অস্পষ্ট বাধ বাধ ক্ষীণ কোমল কণ্ঠে বললে—'বড় অসহায় হয়ে পড়েছি। দয়া করে কিছু সাহায্য করুন।'

ছেলেটি বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। অন্যদিকে চেয়ে শিস্ দিতে দিতে পায়চারি শুরু করে দিলে যেন বেশি জোরেই!

পাশ দিয়ে সাইকেলে চড়ে একজন হেঁকে চলে যাচ্ছিল, আনন্দবাজার অমৃতবাজার হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড যুগান্তর।

ছেলেটি তাকে ডাক হাঁক করে থামালো। এক আনা দিয়ে কিনলে একখানি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড। মনোযোগ দিলে সংবাদে। তার এই ডাক হাঁকে মেয়েটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল সেদিকে। ভিখারিণীও ঠিক সেই সময় এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে।

খবরের কাগজের উপর থেকে ছেলেটির দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করলে।

কি কথা হল দুজনে কিছু শোনা গেলনা কিন্তু দেখা গেল মেয়েটি তার 'ভ্যানিটি ব্যাগ' থেকে 'পার্সটি' বার করে ভিখারিণীর হাতে তুলে দিলে একটি আস্ত টাকা!

'ভগবান আপনাকে সুখে রাখুন।"

ভিখারিণী দাতার কল্যাণ কামনা করে চলে গেল অন্যদিকে।

খবরের কাগজখানা হাতের মুঠোর মধ্যে সজোরে মুড়ে নিয়ে ছেলেটি ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গেল মেয়েটির সামনে। রুখে উঠে বললে—এই সব 'প্রোফেশান্যাল বেগার্'দের পয়সা দিয়ে আপনারা ওদের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বাড়িয়ে তুলেছেন যে ওদের জ্বালায় রাস্তা চলা দায়!

মেয়েটি কিছুই উত্তর দিলনা। একবার ছেলেটির মুখের দিকে—তার হাতের এটাচিকেস্ ও বদ্ধমুষ্টির মধ্যে নিষ্পেষিত সংবাদপত্রখানার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটি যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে। একখানা আপ্ট্রাম ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটে চলে গেল। ফিরিওয়ালা হেঁকে চলেছে 'ল্যাংড়ে আম'! বাক্স হাতে একটা নাপিত চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে। স্তূপাকার কাপড়ের বোঝা পিঠের উপর চাপিয়ে গাধা হাঁকিয়ে একটা ধোপা আসছে মহানির্ব্বাণ মঠের দিক থেকে। ছেলেটি বললে—কিছু মনে করবেন না। আর কিছু নয়, আমি বলছিলুম এই যে ঐ স্ত্রীলোকটিকে বেশ সুস্থ সবল দেখলুম। অনায়াসে কোনও ভদ্র পরিবারে কাজ করেও খেটে খেতে পারে। কিন্তু তা ওরা করবে

না। হাত পাতলেই যদি টাকা পায়, কে আর খাটতে চায় বলুন ?······ তাই বলছিলুম ওদের এই অন্যায় প্রশ্রয় দিয়ে আপনারা সমাজের খুব ক্ষতি করছেন না কি ?

মেয়েটি এবার ছেলেটির দিকে ফিরে কঠিন দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে বেশ একটু তীব্রকণ্ঠেই বললে—ঐ স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করা উচিত ছিল—সর্ব্বাগ্রে আপনারই। কারণ ওর আজকের এই অসহায় অবস্থার জন্য আপনাদের জাতেরই কোনও একজন মহাপুরুষ দায়ী। ওর সর্ব্বস্ব অর্পণ করা বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ওকে নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থায় পথে দাঁড় করিয়ে পালিয়েছে! আপনার চোখ থাকলে দেখতে পেতেন ওর চেহারায়—বেশভূষায় সে নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার সকরুণ ইতিহাস সুস্পষ্ট লেখা রয়েছে। সেই প্রতারকের সন্তানকেই বুকে করে মানুষ করবার জন্য ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে বেঁচে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ওর অবস্থা যে কি ভয়ানক—সে যে কতদূর শোচনীয়—সেত আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমাদের সমাজে এমন কোনও ভদ্র পরিবার নেই যারা ওকে কাজ দেবে বা আশ্রয় দেবে। ওর ওই অল্প বয়স—ওর এই স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য—ওর অজ্ঞাতকুলশীল পরিচয়, আর সবার উপর—ওর কোলের ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশু ঐ স্ত্রীলোকটির কোনও রকম সম্মানজনক জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান অন্তরায়।

মেয়েটি এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে একটু যেন ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল—ভিক্ষা ছাড়া আর একটি মাত্র পথ এ অবস্থায় ওর পক্ষে খোলা আছে জানি, কিন্তু সেটা কি ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে আরও হীন আরও জঘন্য নয় ?

ছেলেটি যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

মেয়েটি বলতে লাগল—কিছু মনে করবেন না। এত কথা বললুম এইজন্য যে আপনাদেরই জাতের একজন যখন ওর প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচার করছে তখন আপনাদেরই কারুর উচিত ওকে যথাসাধ্য সাহায্য করে সেই নিষ্ঠুরতম পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা।

ছেলেটি এবার অত্যন্ত যেন লজ্জিত হয়ে বললে—ক্ষমা করুন আমাকে। আমি অন্যায় করেছি। আমার মাথায় এ সম্ভাবনাটা একেবারেই উঁকি মারেনি! She deserves our sympathy; কিন্তু যে কারণে ওকে আমার সাহায্য করা উচিত ছিল বলছেন, আমি আপনার সে যুক্তি সমর্থন করতে পারলুম না। ওই যে ব্রহ্মার পাপে বিষ্ণুর ফাঁসি এ কোনও আইনেই লেখে না! কিন্তু সে যাই হোক আপনার নামটা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—কুমারী আরতি রায়।

—ও! আপনিই সেই আরতি রায়? গেলবার ত' বি-এ পরীক্ষায় আপনি ইংরাজী সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। এখন য়ুনিভার্সিটির পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে পড়ছেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ…কিন্তু, আপনার পরিচয় ত—

—অত্যন্ত সাধারণ। আমি সর্ব্বোচ্চ স্থানের মানুষ নই। কোনও রকমে কায়ক্লেশে এম-এস-সিটা পাশ করে এখন সায়েন্স কলেজে 'মেটালজি'র সাধনায় স্পেশাল রিসার্চ্চ নিয়ে আছি। আমার নাম মনসিজ দে—এই হিন্দুস্থান পার্কেই থাকি।

—ও! আমি থাকি এই ডোভার লেনে।

—তাই নাকি! আমরা তো তাহলে প্রায় এক পাড়ারই লোক বলুন।

—তা' এ আবিষ্কারের গর্ব্ব আপনি অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু, দোহাই আপনার! কাল যেন আবার আবিষ্কার করে বসবেন না যে, আমরা একই রজকিনীর বাড়ী বসন ধুতে দিই! আপনাদের জাতের ও একটা ছোঁয়াচে রোগ কিনা!

'হাওড়া! হাওড়া! ড্যালহাউসী! হাঁকতে হাঁকতে মনসিজের ওপাশ দিয়া একখানা বাস চলে গেল।

ঢং ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আরতি রায়ের সামনে দিয়েও একখানা ট্রামও চলে গেল।

কিন্তু, কেউই কোনটায় উঠল না।

মনসিজ বললে—তর্কের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি আরতি দেবী যে ও কলঙ্কটা কেবল আমাদের জাতেরই একচেটে নয়। তা' যদি হ'ত, তাহলে, বৈষ্ণব কবিতা ও পদাবলী মোটে রচিতই হ'ত না! কিন্তু সে যাই হোক, আমার সম্বন্ধে আপনাকে আমি এইটুকু অভয় দিতে পারি যে আমি ও রোগের টিকে নিয়েছি!

—তাই নাকি? তা হলে কি আপনাদের বিজ্ঞান কলেজ থেকে কোনও Anti-Love-Vaccine উদ্ভাবিত হয়েছে?

—তা যদি সম্ভব হ'ত তাহ'লে আপনিই যে তার প্রথম এ্যাম্পুলটি ব্যবহার করতেন সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু, এটা বিজ্ঞান কলেজের ব্যাপার নয়। সম্পূর্ণ পারিবারিক গৃহ চিকিৎসা! বাপ মা'র ধ'রে বেঁধে দেওয়া আদি ও অকৃত্রিম বাংলা টিকে! আমি বিবাহিত! বুঝলেন?

—বুঝিচি। কতকটা ভরসাও পেলুম!

এই বলে একটু অর্থপূর্ণ মৃদু হেসে আরতি জিজ্ঞাসা করলে—

"কিন্তু তবুও আপনারা কেউ কেউ সম্পূর্ণ 'ইমিউন' হ'তে পারেন না কেন বলতে পারেন ?"

মনসিজ বললে—তার জন্য দায়ী'ত আপনারাই ! কারণ আপনারাই যুগে যুগে ঐ সংক্রামক রোগের বীজাণু বে-পরোয়াভাবে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন নিখিল পুরুষের অন্তরপুরে।...বাস একখানা আস্‌ছে বলে মনে হচ্ছেনা ?

—হ্যাঁ, হর্ণ শোনা যাচ্ছে।

এমন সময় বহু কণ্ঠের সমস্বরে "চোর !" "চোর !" বলে একটা বিকট চিৎকার কানে এল। একটা লোক হিন্দুস্থান পার্কের গলির ভিতর থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেরিয়ে পড়ল এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো আরতিকে একটা ধাক্কা মেরে রাস্তায় ছিট্‌কে ফেলে দিয়ে ট্রাম লাইন ক্রস্ করে ওদিকের ফুটপাথের উপর দিয়ে ডোভার লেনের দিকে ছুটল।

মনসিজ ব্যস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ ভূলুণ্ঠিতা আরতিকে ধরে তুলতে গেল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই "চোর !" "চোর !" শব্দে পশ্চাদ্ধাবমান এক উন্মত্ত জনতা সেই পলায়নপর লোকটির অনুসরণে ছুটে এসে তাকেও এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে দিয়ে বেরিয়ে গেল ! পথের পথিকরাও অনেকে ছুটে চলল তাদের সঙ্গে।

ঠিক সেই সময় এক লহমার মধ্যেই রাস্তার ধারের পানের দোকান, খাবারের দোকান, মনিহারীর দোকান থেকে সমবেত কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল "সরে যান ! সরে যান !"

"এই গেল গেল গেল—রোকো ! রোকো !"

ঘন ঘন হর্ণ বাজাতে বাজাতে প্রকাণ্ড একখানা যাত্রী বোঝাই বাস্

বেগে এসে পড়ল একেবারে তাদের ঘাড়ের উপর! সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখ দিয়ে বেরুল একটা করুণ কাতর আর্ত্তনাদ—"হায়! হায়! হায়! হায়!"

প্রায় একমাস পরের ঘটনা।

ডোভার লেনে আরতি রায়দের বাড়ী। আরতি বিছনায় উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানা চটি ইংরাজী বই পড়ছিল।

আরতি উপস্থিত একটু ভাল আছে বটে কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি।

আরতির দিদি ভারতী রায় বি-এ, বি-টি দক্ষিণ কলিকাতা গার্লস্ স্কুলের হেড-মিষ্ট্রেস্। বয়স অনুমান তিরিশ। মনের মতো পাত্রের অভাবে আজও কুমারী জীবন যাপন করছেন। তাঁকে বেশ একটু স্থূলকায়াই বলা চলে। রং ফর্সা না হলেও—কালো নন তিনি। বয়সের আধিক্য এখনও তাঁর মুখের লাবণ্য ও মনের তারুণ্যকে ম্লান করতে পারেনি। সদা হাস্যময়ী প্রকৃতি। চির প্রফুল্ল তাঁর মন-মন্দার! সর্ব্বদা কণ্ঠে গানের সুর লেগেই আছে। যেন সঙ্গীতের অফুরন্ত ঝরণা—সুরের তরঙ্গায়িত সুরধুনী।

ভোর থেকে উঠে নিজের হাতে সমস্ত গৃহকর্ম্ম করেন অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সঙ্গে— অবলীলায়—অবিরাম গান গাইতে গাইতে।

তার কণ্ঠের কূজন দীর্ঘক্ষণ শোনা না গেলে আশেপাশের বাড়ীর মেয়েরা বলাবলি করে—দশটা বেজে গেছে বোধ হয়। বুলবুলির সাড়া পাচ্ছিনাত?

আবার বিকেলে যখন তার গানের ঝঙ্কার কাণে আসে তারা বলাবলি করে—ঐরে চারটে বাজল! বুলবুলি বাসায় ফিরেছে।

আরতি ও ভারতী দুটি বোনের এই ছোট্ট সংসারটুকু আশেপাশের তুলনায় যেন মরুর বুকে মরূদ্যান! আগাগোড়া সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক জিনিসটা ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে। ড্রয়িংরুম, বেডরুম, ষ্টোর, কিচেন সব যেন ছবির মতো পরিপাটী করে সাজানো গোছানো। একটা আলপিন পড়লে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাদের এই পরিচ্ছন্নতার কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে আরতি বলে—তার কারণ এবাড়ীতে কোনও নোংরা জীব নেই! বাড়ী অপরিষ্কার করে যত পুরুষ মানুষেরাই কিনা! অমন এলমেলো অগোছালো জাত তো আর দুটি নেই! অদূরে ভারতীর কণ্ঠ শোনা গেল—যেন বীণার ঝঙ্কারের মতো!

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমিব বিদারি উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়!

ভারতী দেবী ঘরে ঢুকে এক ঝলক হাসির আলো ঝরিয়ে দিয়ে বললেন—

এতদিন যে বসেছিলেম পথচেয়ে আর কালগুণে
দেখা পেলেম ফাগুনে!

—"তোর শিভালরাস্ নাইট এরাণ্ট দেখি ঠিক ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসে হাজির হয় রোজ! এটা কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয় রতি। চারটের পর আসবেন বলেছিস বলেই কি চারটের পর না হলে

উনি আসবেন না ? এ কী রকম ? চারটেয় বললে দুটোয় এসে হাজির হবে তবে না বুঝি ব্যগ্রতা !

—আঃ ! দিদি ! যত বয়স বাড়ছে, তুমি যেন কী হয়ে যাচ্ছ ! যাও, ওঁকে নিয়ে এস। মিছি মিছি বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন এতক্ষণ ? উনি কি মনে করবেন বলোত !

—"রাই ধৈর্য্যং—রাই ধৈর্য্যং"—এই যে 'উনি' 'ওঁকে' শুরু করেছ, ব্যাপার কি ? একেবারে সর্ব্বনামে এসে পৌছে গেছ দেখছি। কিন্তু বাপু, রাগই করো আর যাই করো, তোমার 'ওঁকে' আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনি। এসে বসলে আর উঠতে চায় না ! কাজকর্ম্মের বড় ক্ষতি করে। বুদ্ধি বিবেচনা যদি এতটুকু থাকে। রোগা মানুষ তুই। তোকে সারাক্ষণ বকিয়ে মারে দেখি ! কথাতো' ছাই, মাথা আর মুণ্ডু ! যত রাজ্যের বাজে উড়ো তর্ক খালি ! তোকেও বলিহারি যাই ! ওর সঙ্গে এত বকতে ভালও লাগে ?

গম্ভীরভাবে আরতি বললে,—তুমি ভুলে যাচ্ছ দিদি উনি আমার 'সেভ্যিয়র !' আমার 'হিরো !' সেদিন উনি না থাকলে আমাকে আর দেখতেই পেতেনা ! নিজে আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েও যেভাবে আমাকে চক্ষের নিমেষে বাসের সামনে থেকে অসঙ্কোচে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বাঁচিয়েছিলেন, সবাই বললে ও রকম অদ্ভুত সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতি খুব কমই দেখা যায়। আমার কি মনে হয় জানো দিদি—এ কাজ করতে পারে শুধু তারাই যারা প্রকৃত বলিষ্ঠ চরিত্র ও সংস্বভাবের পুরুষ। দেহে মনে সুস্থ সংযত ও আত্মবিশ্বাসী না হ'লে কোনও পুরুষ মানুষের দ্বারা কখনই এ কাজ সম্ভব হত না।

ভারতীর দুই চোখে দুষ্টুমীর হাসি ফুটে উঠল। বললে "বুঝিছি লো

বুঝেছি! পুরুষের ছোঁয়া লেগে তোর মধ্যের সুসুপ্ত নারীত্ব জেগে উঠেছে। কিন্তু এই স্পর্শদোষ ঘটায় অবস্থা যে তোর বড় সঙীন হয়ে পড়েছে দেখছি!

—আচ্ছা বেশ! তুমি ভয়ানক অসভ্য! এখন যাও দেখি; ওঁকে অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ। ছুটে গিয়ে ভিতরে নিয়ে এস।

ভারতী গেয়ে উঠল—

আমি কহিলাম, কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিনী নারী!
সে কহিল, আমি যারে চাই তার
নাম না বলিতে পারি!

আরতি অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠল—তুমি দেখছি আমার সৌভাগ্যে রীতিমত 'জ্যেলাস্' হয়ে উঠেছ দিদি! old maidএর সমস্ত শোচনীয় লক্ষণই তোমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে! ভূপেনবাবু এখনও তোমার আশা একেবারে ছাড়েননি দিদি। তোমার উচিত আর একদিনও অকারণ বিলম্ব না করে তাঁকে প্রসন্নমনে বরণ করা। মেয়েদের যৌবন সূর্য্যের প্রখর তেজের মতই ক্ষণস্থায়ী! কখন যে মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যায়, আসে অপরাহ্ন, মানুষ তা বুঝতে পারেনা। উষার আলোর মতো স্নিগ্ধ যে কিশোরী দেখতে দেখতে তার দীপ্ত মধ্যাহ্ন ও মেত্তর অপরাহ্ন পার হয়ে সে একদা সন্ধ্যার বন্ধ্যা বৃদ্ধায় রূপান্তরিত হয়।

শ্রীমতী ভারতী কিন্তু এই অবকাশে আরতির ড্রেসিং মিরারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কেশ বেশ সুবিন্যস্ত করতে করতে গুণ গুণ করে আবৃত্তি করছিল—

"যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অন্য মনে গিয়েছ কি ভুলি
হে ভোলা সন্ন্যাসী !
চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুক মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি ?

সম্ভবতঃ যৌবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েই ভারতী দেবী এই বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন—

বাহির হইতে দেখোনা এমন করে'
দেখোনা আমায় বাহিরে
আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে
আমার বেদনা খুঁজনা আমার বুকে
আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে—

তারপরে আর শোনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরেই মনসিজকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি উপরে উঠে এলেন। আরতি শুনতে পেলে দিদি তাকে সিঁড়িতে এই বলতে বলতে নিয়ে আসছে—কাল থেকে একটু সকাল করে এস ভাই। সারাদিন বেচারা একলাটি পড়ে থাকে। একটা কথা বলবার লোক পায় না। কখন চারটে বাজবে—তুমি আসবে—এই আশায় পথ চেয়ে ছটফট করে।

মনসিজ একটু ইতস্ততঃ করে বললে—উনি যে আমাকে চারটের আগে আসতে নিষেধ করেছেন।

—আর তুমি অমনি সুবোধ বালকের মতো নতশিরে সেই আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছো ! ছিঃ, লেখাপড়া শিখে সভ্য হয়ে তোমরা সব এমন অমানুষ হয়ে পড়েছ। প্রাচীন কালের বর্ব্বর পুরুষেরাও তোমাদের

চেয়ে ঢের বেশী সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত ছিল।······নিষেধ করেছেন! আরে ও নিষেধের কোনও মানে হয়? Silly! মুখের কথাটাকেই কি বড় বলে মানতে হবে? আর মনের সত্যটা হবে অবজ্ঞাত?

মনসিজ দিদির এ হেঁয়ালীর একটা সুস্পষ্ট অর্থ কিছু বুঝতে পারলেনা বটে কিন্তু ওদিকে ঘরের ভিতর আরতি একেবারে রাগে দুঃখে লজ্জায় মরমে মরে যেতে লাগল।

ভারতী ঘরের দ্বারপথে এসে দাঁড়াতেই সে কঠিন ভর্ৎসনার কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল—দিদি! কী বলছিলে তুমি ওঁকে সব?

কিন্তু দিদি ততক্ষণে লঘুপক্ষ উড়ন্ত পাখীর মতো চক্ষের নিমেষে নীচেয় নেমে গেছেন। রন্ধনশালা থেকে তাঁর স্বর ভেসে আসছে—

"আমার চিরবাঞ্ছিত এস, আমার চিরসঞ্চিত এস
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজ বন্ধনে ফিরে এস!"

ঘরে ঢুকে আরতির শয্যার কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে মনসিজ বললে—উত্তেজিত হবেন না। আজ কেমন আছেন? বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হয়ে পড়া একটুও অস্বাভাবিক নয়, সুতরাং তার জন্য ত লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই।

—সে আমি জানি। এবং এও আমি জানি যে, যেখানে কোনও পুরুষ বন্ধুর জন্য কোনও নারী বন্ধু প্রতীক্ষা করে থাকেন, সেখানে পুরুষ বন্ধুটির পক্ষে সেটা যে শুধু গৌরবেরই তাই নয়, আর পাঁচজন বন্ধুর কাছে গর্ব্ব করে বলে বেড়াবার মত ব্যাপারও বটে।

—আপনি 'বন্ধু' শব্দটার সংজ্ঞা অত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ছোট করে দেখছেন কেন? বন্ধু পুরুষই হোন আর নারীই হোন, 'বন্ধু' ছাড়া তাঁর আর কোনও পরিচয় ত নেই! এর মধ্যে যদি আপনি স্ত্রী-পুরুষ ভেদ

এনে ওকে বিশেষার্থ বাচক করে তোলেন তাহলে সেখানে ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্‌সের প্রশ্নটা এসে পড়ে না কি?

—হয়ত পড়ে। এবং বুদ্ধি সেটা যতই অস্বীকার করুকনা কেন—মন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা না মেনে পারে না। এই বিশেষ জ্ঞান এইখানে অপরিহার্য্য। তবে আসল কথা কি জানেন? লজ্জা আমার ঐ অসত্য অর্দ্ধসত্য বা সত্য কথাগুলো অপর পক্ষের গোচরে আনার জন্য নয়, লজ্জা পাই এর মধ্যে যে যাচিঞার দৈন্যটুকু প্রকাশ পায় তার জন্য। লজ্জা পাই সেই কাঙালপনা, সেই উঞ্ছবৃত্তির হেয়তা উপলব্ধি করে!

—ভুল করছেন আরতি দেবী, বাঞ্ছিত বন্ধুর সান্নিধ্য লাভের এই অতি স্বাভাবিক আকাঙ্খার মধ্যে বিন্দুমাত্র হীনতা নেই। ওটা ভিক্ষা নয় একেবারেই। বন্ধুত্বের বৃহত্তম দাবীটাই ওতে বিঘোষিত হয় একান্ত সহজ ও শিষ্টাচার সঙ্গত উপায়ে।

—বুঝলুম। কিন্তু সে বন্ধুত্বের দাবীতে সেই রকম দুটি নরনারীরই অধিকার থাকা সম্ভব—যাদের মিলনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ সরণীর মতো সুগম, যাদের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার পরিণামে ঈপ্সিত দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে কোনও কঠিন প্রতিবন্ধকতা নেই।

—মার্জ্জনা করবেন আরতি দেবী, আমি আপনার এ ভ্রান্ত অভিমতের সসম্মানে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যে পথ সুগম—যে পথে বাধা বিঘ্ন নেই—দুঃসাহসী অভিযাত্রীর মনকে কোনওদিনই সে পথ আকর্ষণ করতে পারে না। তাছাড়া, এ কথাও আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে হৃদয়াবেগ যেখানে প্রবল সেখানে কোন বাধাই তার অগ্রগতিকে নিরোধ করতে পারে না। প্রতিবন্ধকতার সংঘর্ষ তাকে বিজয়াভিযানে অধিকতর শক্তি সাহস ও উন্মাদনা এনে দেয়।

—আপনাকে কেবলমাত্র একজন রাসায়নিক বলেই জেনেছিলুম কিন্তু এখন দেখছি আপনি শুধু সুকঠিন ধাতুতত্ত্বনিয়েই গবেষণা করেন না, মানুষের মনের কোমল ও দুর্ব্বল প্রকৃতিগুলির অনুশীলনেও বহু সময় অপব্যয় করেন!

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে ওটাও রসেরই ব্যাপার সুতরাং রসায়নের বহির্ভূত বিষয় নয়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই বস্তুকেই বলে গেছেন—আদিরস। আর আপনার ভাষায় বলা যেতে পারে যে—আমাদের জাতটা বহুকাল থেকেই এই আদি রসের চর্চ্চা করে আসছে—কাব্যে—সাহিত্যে—জীবনে—এমনকি ধর্ম্মেও।

—ধর্ম্মেও? ধর্ম্ম প্রসঙ্গে এ অধর্ম্মের অবতারণা যে কোথাও আছে এমন কথাতো কখনও শুনিনি?

—সে কথা পরে বলছি। উপস্থিত আপনি এইমাত্র একে এই যে 'অধর্ম্ম'রূপ একটা অশ্রদ্ধেয় আখ্যা দিলেন আমি প্রথমে এর সেই দুর্ণাম খণ্ডন করতে চাই। ধর্ম্ম বলতে আপনি কি বোঝেন? অভিধান বলে—ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে—যা ধারণ করে থাকে। বেশ কথা। এখন এই অর্থটাকে যদি একটু ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ সৃষ্টিকেই ধারণ করে আছে অনাদি কাল থেকেই ঐ আদিরস এবং থাকবেও হয়ত অনন্ত কাল পর্য্যন্ত। আপনি একজন গ্র্যাজুয়েট। সুতরাং ধরে নিতে পারি যে 'বায়োলজি' আপনার কম্বিনেশনের মধ্যে না থাকলেও আপনি ও বিজ্ঞানটার সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নন। অতএব বিশদ ব্যাখ্যা করে আপনাকে কিছু বোঝাবার প্রয়োজন নেই বোধ হয়।

আরতি নতনেত্রে মৃদু হেসে বললেন—বোধ হয়।

—দেখুন, অনেকে মনে করেন মহিলাদের সঙ্গে, বিশেষ করে আবার অবিবাহিতা তরুণীদের সঙ্গে এ প্রসঙ্গ নিয়ে পুরুষের পক্ষে আলোচনা করাটা নাকি অত্যন্ত অশোভন এবং শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু আপনি কি এই মূঢ়নীতি সমর্থন করেন? আপনারাইত' দেশের ও জাতির ভাবী জননী, স্থতরাং জীবজগতের এই জন্মরহস্য সম্বন্ধে আপনাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা বা সুসম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা শুধু উচিতই নয়, অত্যাবশ্যকীয় নয় কি? এ বিষয়ে আমি ডক্টর মেরি ষ্টোপসের অভিমতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। জননীদের শিক্ষা জননীদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকলে ভবিষ্যদ্বংশধরগণের জীবনে উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা খুবই কম।

আরতি মৃদুস্বরে বললে—ওসব তর্ক-সাপেক্ষ ব্যাপার ছেড়ে শুধু ধর্ম্মের সঙ্গে এ বিষয়টার কোথায় কি ভাবে যোগাযোগ একটু বলবেন কি?

—আপনি আমাকে অবাক করলেন আরতি দেবী! সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে এখন জিজ্ঞাসা করছেন অভাগিনী সীতা কার ভার্য্যা? বায়োলজির মূল তত্ত্বটা কি? জীবধর্ম্ম বইত নয়! আদিম যুগের অশিক্ষিত মানুষেরা সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক রহস্য ভেদ করতে না পারলেও মোটামুটি সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টিকর্ত্তার একটা স্থূল ধারণা তাদের হয়েছিল—এবং শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সৃষ্টির সেই মূলাধারের মূর্ত্তি বা প্রতীক গড়ে পূজা করতে শুরু করেছিল! আমি "Phalic worship" এর কথা বলছি। —ঐ যে মন্দিরে মন্দিরে আজও ঐ গৌরীপট্টে স্থাপিত শিবলিঙ্গের পূজা চলেছে, ওটা সেই আদিম যুগের আবিষ্কৃত সৃষ্টির মূল ও স্থূল রূপের উপাসনা ছাড়া আর কিছু নয়!

আরতির চোখমুখ যে এদিকে লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে সেদিকে মনসিজের ভ্রূক্ষেপ নেই! সে বলে চলেছে—কালক্রমে বুদ্ধি ও

জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রকৃতির বিপুল শক্তি সমূহেরও পূজা শুরু করে দিলে। আদিত্যদেব আলোক দান করেন, পর্জ্জন্যদেব বারি বর্ষণ করেন, অগ্নিদেব যজ্ঞানলের শিখা জ্বালেন, বরুণদেব জলদেবতা—এমনি করে একে একে আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতার আবির্ভাব হল। বড় বড় মারাত্মক রোগগুলোকেও আমরা মৃত্যুদেবতা যমের গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত করে নিলুম, যেমন শীতলা দেবী প্রভৃতি! আর্য্য অনার্য্য সমস্যার ফলে এই দেবতা সমস্যা এক সময় জটিল হয়ে উঠেছিল। জ্বররোগ 'জ্বরাসুর' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। এ জ্বর সম্ভবতঃ ম্যালিগ্‌ন্যণ্ট ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্ বা কালাজ্বর এমনিতর সাংঘাতিক কিছু হবেই।

আরতি মৃদু হেসে বললে—আর ওলাউঠা দেবী? তিনি কতদিনের দেবতা?

—আরে, উনি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন। ওঁর নাম ওলাউঠা দেবী নয়—উনি 'ওলাবিবি'—মুসলমান যুগে ওঁর আবির্ভাব! এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। মানুষ রোগেরও স্ত্রীপুরুষ ভেদ নির্ণয় করেছিল, যেমন করেছিল সে তার উপাস্য ধর্ম্মের মধ্যে পূজনীয় দেব-দেবীর বিভাগ। কিন্তু একদিন এল এই মানুষের কল্পিত সব দেব দেবী নিয়ে ধর্ম্মপূজার প্রতিক্রিয়া! এল বৌদ্ধ শূন্যবাদ। নাস্তিকদের নিরীশ্বরবাদ—বৈদিক একেশ্বরবাদও পুনরায় মাথা চাড়া দিলে। কিন্তু, মানুষ ভালবাসে—মানুষ চায়—ধর্ম্মের নামে খেলা করতে! কাজেই ওসব টিকল না! বৌদ্ধ মন্দিরেও একে একে দেবদেবীরা সব দেখা দিতে শুরু করলেন। শুধু প্রজ্ঞা-পারমিতা অবলোকিতেশ্বরে আর কুলিয়ে উঠল না! বৌদ্ধ যুগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পঞ্চমকার নিয়ে তান্ত্রিক শক্তি সাধনা। এবং সেই জিনিসই পরে দেখা দিল পঞ্চদশ শতাব্দী কি তারও কিছু

আগে থেকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রসূত 'সহজিয়া সাধনার' রূপ ধরে! এ দুটোই সেই আদিম যুগের বর্ব্বরতার রকম ফের মাত্র! তফাৎ শুধু প্রাচীনটা ছিল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু পরের ব্যাপারটা হয়ে উঠল এক বীভৎস ব্যভিচার! একটা জিনিস দেখতে পান না কি?—ধর্ম্মে আমরা বরাবরই যুগলের উপাসক? আদিম যুগে ছিলেন শিবগৌরী; মধ্য যুগে এলেন কৃষ্ণরাধা; পৌরাণিক যুগে প্রকট হলেন সীতারাম। আমরা আমাদের স্ত্রীকে বলি ধর্ম্মপত্নী বা সহধর্ম্মিণী। আমাদের শাস্ত্রীয় উপদেশ হচ্ছে—সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ! এর মানে বোঝেন ত? অর্থাৎ কিনা স্ত্রীলোক ছাড়া—

বাধা দিয়ে আরতি হাসতে হাসতে বললে—থাক আর আপনাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমি আপনার ইন্ফ্যান্ট ক্লাশের ছাত্রী নই। ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। আপনি ওকালতী ব্যবসায়ে নামলে খুব উন্নতি করতে পারতেন কিন্তু। লোককে এমন সব অকাট্য যুক্তি তর্ক তুলে জলের মত বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে পারেন! আমি তো আশ্চর্য্য হয়ে যাই! আপনার সঙ্গে তাই রোজই আমার তর্কে হার হয়—

—কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত তো দেখি আমাকেই রোজ হার স্বীকার করে নিয়ে যেতে হয় আপনার কাছে!

আরতি হেসে উঠে বললে—ওটা বোধ হয় আপনাদের 'জীব-ধর্ম্ম'! মেয়েদের তোষণ ব্যাপারটা আপনারা সকলেই বেশ স্বেচ্ছায় পরিপোষণ করেন দেখি—

বারান্দায় দিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"তবে শেষ করে দাও শেষ গান আজ
তারপরে চলো যাই চলে,

তুমি ভুলে যেয়ো সখা এ রজনী কাল
আজ রজনী ভোর হলে —।"

—বলি দে মশাই, ভোর হতে তো আর দেরী নেই। যখন এত রাতই করলেন, রোগা মানুষের খাবার সময়টাও যখন উতরেই গেল—তখন এই খানেই না হয় এবেলার মতো পিত্তি রক্ষে করে যান—দু'টি যাহোক কিছু মুখে দিয়ে।

—আঃ দিদি! অমনি করে বুঝি কোনও ভদ্রলোককে তোমার কাছে খেয়ে যাবার জন্য বলতে হয়? উনি তোমার কথায় কি রকম লজ্জিত হয়ে পড়ছেন দেখ ত!

—এঁ্যা! লজ্জিত হয়ে পড়েছেন নাকি? কোনই আশা ভরসা নেই তাহলে! মশাই! শুনছেন—? ও ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। ত্রিগুণাতীত হ'তে না পারলে এ ভবসংসারে 'পরম-গুরু' হওয়া যায় না! এসব ভাগবতের কথা। হাসবেন না।—আপনাকে তাহলে এইবার একটু ভাল করে আবাহন করি কেমন? বিশেষ যখন আমার ভগ্নী এতটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন—ভারতী গান ধরলে—

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি
রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি,
তুমি এস হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ!

—আঃ! দিদি? কী হচ্ছে ও তোমার?……

—অসহ্য বোধ হ'চ্ছে ত? ও হবেই। অপর কারুর মুখে এ সম্বোধনগুলো সইতে পারা যায় না দিদি জানি! কিন্তু বোন এ সবত' তোমারি জবানী—শুধু আমার মুখ দিয়ে ওঁকে শোনাচ্ছি বইত নয়—ভারতী গান ধরলে—

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখ না মনে
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে !

মনসিজ চেয়ার ছেড়ে আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন একবার বাঁ হাতের রিষ্ট ওয়াচটার দিকে চেয়ে চমকে উঠে বললে—ঈষ্‌! ৯টা বেজে গেছে দেখছি ! নমস্কার ! আমি চললুম—

ভারতী চেঁচিয়ে বললে—আমার কথাটা মনে আছে ত ? কাল সকাল সকাল আসতে হবে। বুঝলেন ?—

বছর ঘুরে গেছে।

ভারতী ভূপেন্দ্র সম্মেলন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। মনসিজ এ বিবাহে একা দশজনের মতো খেটেছিল। সবাই বলে গেছে উনি না থাকলে ব্যাপারটা এমন সুচারুভাবে সম্পাদন হ'ত কিনা সন্দেহ। সুন্দর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্ন, গাত্রহরিদ্রা থেকে শুরু করে বিবাহবাসর, বিবাহ আসর, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের আদর অভ্যর্থনা, ভূরিভোজ এবং সব শেষ ফুলশয্যার বিচিত্র মধুর আয়োজন মনসিজ তার সুযোগ্য সহকর্ম্মিণী আরতির অক্লান্ত সাহায্য পেয়ে অতি সুশোভন ও রমণীয় করে তুলেছিল।

কৃতজ্ঞ ভুপেনবাবু বার বার বলেছেন—"পাওনা রইল হে ভায়া। সবই তোমার পাওনা রইল। তোমার বেলা আমি এ ঋণ সুদে আসলে শোধ ক'রে দেব দেখো। তোমারও শুভদিন ত' এগিয়ে আসছে ! সেদিন আমরা তোমাদের ফাঁকি দেবনা।"

ভারতী ও ভূপেন্দ্র আজ ৩টার শো'তে 'লাইট হাউসে' গেছে। এখনি মনসিজ আসবে বলে আরতি আর তাদের সঙ্গে সিনেমায় যায়নি।

মনসিজ সেদিন একান্ত অসঙ্কোচেই আরতিকে ডেকে বললে—তোমার কথাই বুঝি সত্য হয়ে উঠল রতি। অভিভাবকরা যথাকালে টিকা দেওয়া সত্ত্বেও প্রণয় বীজাণুর মারিগুটি থেকে অব্যাহতি পেলুম না বন্ধু। একদা কোন শুভক্ষণে আমাদের সেই ক্ষণিকের পথের দেখা যে ভবিষ্যতে একদিন এমন করে আমার জীবনপথে চিরন্তনের সমস্যা হয়ে দেখা দেবে সে কথা কল্পনাও করতে পারিনি।

হঠাৎ মনসিজের মুখে এ ধরণের কথা শোনবার জন্য আরতি ঠিক প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কেটে যাবার পর সে বললে—

ঠিক এমনটা যে হবে সে কথা আমিও ভাবিনি বটে, কিন্তু সন্দেহ যে করিনি এমন কথা বলতে পারিনা বন্ধু! সমস্ত পুরুষ জাতিকেই আমি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে এসেছি। কারণ মেয়েদের সঙ্গে তারা একমাত্র সেই চিরপুরাতন আদিরসমিশ্রিত সম্পর্ক ছাড়া আর কোনও সম্বন্ধ কল্পনাই করতে পারেনা! কিন্তু, তোমার মধ্যে আমি প্রথম দেখেছিলুম এক নূতন মানুষকে। কি জানি কেন তোমার নির্ভীকতা, তোমার স্পষ্টবাদিতা—তোমার বলিষ্ঠ পৌরুষ আমার দৃষ্টিকে একেবারে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তুমি হলে জয়ী। বিজয়িনীর গর্ব্ব ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে আমার হার মানা হার পরিয়ে দিলুম তোমার কণ্ঠে, পরিয়ে দিলুম তোমার ললাটে আমার অন্তরের রক্তরাগে রঞ্জিত অনুরাগের রাজটীকা।

মনসিজ তার মনের অপ্রত্যাশিত আনন্দ উত্তেজনাকে প্রবল চেষ্টায় কতকটা শান্ত করে নিয়ে বললে—দেখ রতি,—কথাটা খুব মামুলি শোনাবে হয়ত। কিন্তু স্বীকার না করেও পারছিনি যে তোমাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে কাছে পাবার একটা তীব্র ব্যাকুলতা আমাকে অহরহ পীড়া

দিচ্ছে! আমার জীবন—আমার পৃথিবী—তোমার অভাবে হয়ত' ব্যর্থ ও নিরানন্দ হ'য়ে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে ঢেকে যাবে।

—পৃথিবীটা বুঝি শুধু একা তোমারই! জীবনের আনন্দোপলব্ধি ও সার্থকতা লাভের লোভ বুঝি আমাদের মনে এতটুকুও নেই? কিন্তু, শোন, আমার কথা রাখ। মন স্থির কর বন্ধু। তুমি ত' অধৈর্য্য নও। সুমেরুর মত অটল অবিচল দেখেছি তোমাকে। বারম্বার আমার কঠিন আঘাত প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে আমারই বুকে। রক্তাক্ত হয়েছে আমার চিত্ত। বিপর্য্যস্ত হয়েছে আমার মন। অশ্রুজল বাধা মানেনি। কত বিনিদ্র রাত্রে, কত কর্ম্মহীন অলস দিনে আমি ভেবেছি শুধু তোমারই কথা!—কিন্তু তোমাকে দেখেছি স্থির ও নির্ব্বিকার! দেখেছি নিষ্কলঙ্ক অগ্নিশিখার মতো নির্ম্মল ও ভাস্বর! তোমার সেই ঔদাসিন্য উন্মাদ করে তুলেছিল আমাকে। তোমাকে জয় করবার সর্ব্বস্ব পণ নিয়ে আমি তাই অন্ধের মতো ছুটে চলেছিলুম—তোমার অনুসরণে। তোমার স্ত্রীর অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্যও আমার স্মৃতিপথে উঁকি মারেনি।

—আমিও ভেবে পাচ্ছিনি রতি যে আমার পক্ষেই বা তাকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকা কি ক'রে সম্ভব হল! মাস আষ্টেক আগেও তো তার অভিমান ও অভিযোগে ভরা চিঠি পেয়ে তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমি গেছলুম তার কাছে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে আমার মনের মধ্যে তার অস্তিত্ব কোথাও নেই! কী আশ্চর্য্য এই মানুষের মন।

—তার চেয়েও আশ্চর্য্য এই যে—তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কোনও আলোচনাই হয়নি! তুমি শুনে হয়ত বিস্মিত হবে যে আমার দিদি বা ভূপেনবাবু ওঁরা এখনও কেউই জানেন না যে তুমি বিবাহিত এবং তোমার স্ত্রী জীবিত আছেন। তাঁকে আমরা

গোড়া থেকে এমনভাবে এড়িয়ে চলাতেই কারো উপেক্ষিতার মতো তিনি আমাদের জীবনপথের সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেছেন। বলোত আজ তার কথা। শুনি তার সমস্ত কাহিনী তোমার মুখে। কেমন দেখতে তিনি? সুন্দরী কি?

—সুন্দরী কিনা জানিনি। তবে রং ফর্সা হলেই যদি কাউকে সুন্দর বলা চলে তা হলে বলতেই হবে যে—অসুন্দর সে নয়।

আরতির মুখের উপর যেন কিসের একটা ছায়া এসে পড়ল। তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ যেন আহত বলেও মনে হল যখন সে বললে—বোধ করি তাকে সম্পূর্ণ নির্গুণও বলা চলেনা?

—গুণাগুণের সবিশেষ পরিচয় নেবার অবাধ সুযোগ হয়ে ওঠেনি আমার জীবনে আজও। বাঙালীর ঘরের আর পাঁচজন সাধারণ স্বামীর মতই পত্নীর সান্নিধ্য লাভের অতি অল্পই অবসর ঘটেছিল আমার এবং সেই স্বল্প অবকাশের মধ্যে একমাত্র শিক্ষায় অনগ্রসরতা ভিন্ন তার অপর কোনও গুণহীনতার পরিচয় পাইনি যখন, তখন 'লজিক্যালি' তাকে নির্গুণ বলাও যে চলে না—এ কথাও ঠিক।

আরতির মুখে আরও একপর্দ্দা ছায়া ঘনিয়ে উঠল। বেশ সুস্পষ্ট ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললে—তুমি তাঁর কাছেই ফিরে যাও বন্ধু! দাম্পত্য জীবনের সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই আমাদের কিছু। দ্বার রোধ করে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে অতিক্রম করে যাবার সাহস ও স্পর্দ্ধা আমার নেই! আমার বিবেকও বলছে সেটা উচিত হবেনা। তার চেয়ে এস বন্ধু, আমরা সৌহার্দ্দের উদার প্রাঙ্গণে প্রীতির বন্ধনটাকেই অবলম্বন ক'রে জীবনের সোনাদিনগুলো কাটিয়ে দিয়ে চলে যাই!

—সে পথ আমাদের মনের বিকারে আজ পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে রতি। প্রতিপদে পদস্খলনের সম্ভাবনা নিয়ে চলবার চেষ্টা শুধু বিপজ্জনক নয়, একান্ত অশান্তিকরও বটে।

—কিন্তু, তোমার স্ত্রী! তিনি কি আমাদের এই অনধিকার দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে অধিকতর অশান্তির কারণ হয়ে উঠবেন না?

মনসিজ কোনও উত্তর দিলে না। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দেখে আরতি বলতে লাগল—তুমি হয়ত বলবে এ দেশের পুরুষেরা ত বহুকাল থেকেই একাধিক বিবাহ করে এসেছেন। আজও অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ সে প্রাচীন কুপ্রথার অনুসরণ করছেন দেখতে পাই। কিন্তু বন্ধু! আমি যদি ঐ অসম্মানকর জীবন বরণ করে নিতে অসম্মত হই, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমার ধারণা কি জানো? বিবাহিতা প্রথমা স্ত্রী যে গৃহে বর্ত্তমান, সেখানে দ্বিতীয়া স্ত্রী হয়ে যিনি আসেন, তিনি আসেন নেহাৎই একজন স্ত্রীলোক হিসাবে! স্ত্রী হিসাবে নয়!

মনসিজ যেন একটু উত্তেজিত হয়েই বলে উঠল—তোমাকে আমি অপমান করতে চাইনা রতি। আমাকে যেন ভুল বুঝ'না যদি আমি যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে প্রমাণ করি যে বিবাহের সব কিছু sanctity ও religious ceremony সত্ত্বেও যে দুটি নরনারী অগ্নি ও শালগ্রামশিলা সাক্ষী রেখে পতিপত্নীর তথাকথিত পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তার মধ্যে সেই আদি যুগের স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটিত সৃষ্টির urgeটাই প্রধান বা সবচেয়ে বড় কথা—প্রেম, ভালবাসা, প্রণয়, অনুরাগ এ সমস্তই সেই আদিম আদিরসাশ্রিত মিলনের একটা vehicle মাত্র!

আর্ত্তকণ্ঠে আরতি কেঁদে উঠল—ওগো! চুপ কর, চুপ কর, দোহাই তোমার! দুটি পায়ে পড়ি—লক্ষীটি! এমন করে অখণ্ডনীয় যুক্তি ও

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে তুমি আমাদের নারী জাতির সকল গর্ব্ব সকল আদর্শকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়োনা! ওগো! হোক সে মিথ্যে, হোক সে মূঢ়তা, তবু ঐ স্বপ্নের মধ্যেই যে আমরা বাঁচি—আমাদের জীবনকে মধুময় করে তুলি! ঐ মায়া—ঐ যাদুর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শই যে সুখদুঃখময় মাটির পৃথিবীতে আমাদের স্বর্গ রচনার একমাত্র উপায়! ওগো, তুমি তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে চূর্ণ করে দিয়োনা—ধ্বংস করে দিয়োনা—বলতে বলতে আরতি আছাড় খেয়ে পড়ল মনসিজের পায়ে!

মনসিজ প্রস্তরীভূত নিশ্চল মূর্ত্তির মত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সেই ভূলুন্ঠিতার দিকে চেয়ে।

ভারতী ঘরের বিছানা তুলতে তুলতে আপন মনে গাইছিল—

বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে।

ভূপেনবাবু চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে এসে বললেন "আমার প্রাণেও বেজেছে বৌ, কিন্তু উপায় ত কিছু খুঁজে পাচ্ছিনে! কাল রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তার বাসায় খোঁজ করেছি। ছোকরা আসেনি।

ভারতী গাইলে—

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা!
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন! হায় গৃহহারা!

ভূপেনবাবু বললেন—পথবাসীও নয়, গৃহহারাও নয়। খবর নিয়ে এসেছি—তার গতি দেশের দিকেই হয়েছে। ভায়াকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে আসতে হবে দেখ। যে বঁড়শী গিলেছেন তা থেকে

আর অব্যাহতি নেই। এখন আরতি দেবী খেলিয়ে তাকে ডাঙ্গায় একবার তুলতে পারলে হয়।

—আরতিকে তুমি চেননা ভূপ বাহাদুর! সে বোধ হয় ছেলেটিকে বিমুখ করেছে—

মনে যে আশা লয়ে এসেছিল—হলনা হলনা হে
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরে গেল লুকাতে আঁখিজল
বেদনা রহিল মনে মনে।

ভূপেনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন—চুপ! বোধ হচ্ছে যেন আসামী কাঠগড়ায় হাজির! আরতির ঘরে তার গলার সাড়া পেলুম!

কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে তুমি জান!

গানের সঙ্গে সঙ্গে ভূপেন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হয়ে ভারতী বললে "শুধু তোমার এই গুণের জন্যেই শেষ পর্য্যন্ত তোমার গলায় মালা দিতে আমি বাধ্য হলুম ভূপ্! কারণ, দেখলুম আমার এই গানের ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠ যে প্রাণের ভাষা একমাত্র তুমি ছাড়া জগতে আর কেউ তা' বুঝতে পারে না!"

—তবু ত তুমি আমাকে সঙ্গীতে অজ্ঞ বলে দিনে দশবার উপহাস কর!

ভূপেনবাবুর চিবুক ধরে আদর করে ভারতী সোহাগভরে বললে—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী,
তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী!

তুমি সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও মনু, একজন প্রকৃত রসজ্ঞ ও মর্ম্মজ্ঞ মানুষ; সে বিষয়ে আমি তোমাকে ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট দিতে পারি।

ভূপেনবাবু নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালাটা নিকটস্থ একটা টিপয়ের

উপর নামিয়ে রেখে—কণ্ঠলগ্না প্রিয়ার অধরে একটী সদ্য চা-সুরভিত চুম্বন দিয়ে বললেন—আমি যাই বৌ, একটু আড়াল থেকে আড়ি পেতে শুনিগে ফলার পাকতে আর দেরী কত? এ বিয়ে না হয়ে যায় না! স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিরোধী হ'লেও এ মিলন কেউ আটকাতে পারবে না!

—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! চল আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

দু'জনে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল। আরতির ঘরের পিছন দিকের একটা জানলার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল ওরা।

ঘরের ভিতর একপাশে একখানা চেয়ারের উপর মাথায় হাত দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মনসিজ বসে রয়েছে। তার উস্কোখুস্কো এলোমেলো চুল, অগোছাল বেশবাস, তিন চারদিন দাড়ি কামান হয়নি।

পাশে আরতি দাঁড়িয়ে। মুখে তার উদ্বেগের ছায়া! পরম স্নেহে ও সমাদরে আরতি হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তার সেই একমাথা অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে।

দুজনের কারুর মুখেই কোনও কথা নেই।

এমনি নিঃশব্দে কেটে গেল কতক্ষণ! তারপর আরতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে---এর মধ্যেই দেশ থেকে ফিরলে যে?

মনসিজ যেন চমকে উঠল। বললে—কেন?

—বাড়ীর খবর সব ভালত? তোমার একখানা টেলিগ্রাম এসেছিল পরশু দিন—

—তুমি কি করে জানলে?

—আগের দিন তুমি আমার কাছে এলেনা দেখে মনে করলুম অসুখ বিসুখ করেছে হয়ত। তাই পরশু সকালেই গেছলুম তোমার বাসায়

খবর নিতে। তোমার চাকর বললে 'বাবু আগের দিন সকালের গাড়ীতেই দেশে চলে গেছেন।' ঠিক সেই সময়ই টেলিগ্রাম পিয়ন এসে হাঁকলে, 'তার' হ্যায়। তুমি নিজে অগাধ পণ্ডিত হলে কি হবে তোমার চাকরটি একেবারে নিরক্ষর! পিয়ন সই চায়, অগত্যা সে আমার শরণাপন্ন হ'ল। বললে—মা, বাবুর নামটা আপনিই সই করে দিন!·········কে যে তাকে শিখিয়েছে আমায় 'মা' বলে ডাকতে জানিনি। কিন্তু তার মুখে এই 'মা' ডাকটি শুনতে আমার ভারি ভাল লাগে! সই করে নিলুম তোমার টেলিগ্রামখানা। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম! নারী-জনোচিত কৌতূহলের বশে নয়—পরম প্রীতিবদ্ধ বন্ধুর কোনও অশুভ অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়েই আমি তোমার সে টেলিগ্রামখানা খুলে দেখেছিলুম। তাতে শুধু লেখা আছে, "expired last night!" কে যে টেলিগ্রাম করছে, কোথা থেকে করছে, কার শেষযাত্রার শেষবার্ত্তা বহন করে এনেছে এই নির্ম্মম টেলিগ্রাম,—কিছুই বুঝতে পারলুম না! অনেক চেষ্টা করেও ষ্টেশনের নামটা পড়তে পারলুম না! কী যে ভয়ানক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ নিয়ে বাড়ী ফিরেছিলুম—তোমার সে ধারণাই হবেনা। সারাদিন কিছু খেতে পারলুম না—দুর্ভাবনায় রাত্রে ঘুমুতে পারলুম না। দিদি ঠাট্টা করে বল্‌তে লাগল—একদিনের বিরহেই আমাদের রতি ঠাকৃরুণের যদি এই অবস্থা হয়, না জানি মদন ভস্মের পর স্বর্গের রতিদেবীর অবস্থা কী হয়েছিল!······আজ দুদিন অধীর আগ্রহে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। আমাকে সব খুলে বল বন্ধু! আমি যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

—নিশ্চিন্ত আমরা দুজনেই হয়েছি রতি। কেন, বিশু বেটা তোমাকে আগের দিন রাত্রে যে টেলিগ্রামখানা এসেছিল দেখায়নি?

—কই না ?

—বেটা নির্ব্বোধ ! সেখানা ত' এই জামাটার পকেটেই ছিল। বলে এ পকেট সে পকেট হাতড়ে একখানা মোচড়ানো দুমড়ানো টেলিগ্রাম ফর্ম্ম বার করে মনসিজ আরতির হাতে দিয়ে বললে—এখানা পড়লে সমস্ত ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারবে।

আরতি কম্পিত হস্তে টেলিগ্রামখানা নিয়ে তার ভাঁজগুলো হাতের চাপ দিয়ে টেনে চোস্ত করে নিয়ে পড়লে—your wife seriously ill, come sharp !

আরতি আর্ত্তনাদ করে উঠল—কী সর্ব্বনাশ ! কেমন করে এ দুর্ঘটনা ঘটল ?

—যেমন করে বছর বছর বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণী মরছে গ্রামে গ্রামে ! ভাল মিড্‌ওয়াইফ, নার্স ও গায়নোকোলজিষ্টের অভাবে ! প্রসব হতে না পেরে বেঘোরে মারা গেছে আমার স্ত্রী !

—বাচ্চা !

—মায়ের অনুগমন করেছে।

দু'জনেই আবার অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ! পিছনে জানলার ধারে যে দুটি প্রাণী রুদ্ধনিঃশ্বাসে দাঁড়িয়েছিল—তাদের বিস্ময়-বিহ্বলতার বিপুল আলোড়ন বোধ করি একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল।

মনসিজের মাথার চুলের মধ্যে আরতির চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি তখনও ধৈর্য্যশীলা জননীর ন্যায় একান্ত স্নেহে সঞ্চারিত হচ্ছিল। আরতির আর একটি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে মনসিজ নাড়াচাড়া করছিল আপন মনে।

আরতি বললে—কাজকর্ম্ম না সেরেই চলে এলে যে! অশৌচের ক'টাদিন সেখানে তোমার থেকে আসাই ত উচিত ছিল—

—হয়ত ছিল। কিন্তু পারলুম না। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমি পাগলের মতো ছুটে এসেছি—আচ্ছা! এটাকে কি আমাদের মুক্তি বলে মনে করতে পারো তুমি?

আরতি নতমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মনসিজ অধীর হয়ে বলে উঠল—বলো—বলো রতি, চুপ করে থেকনা। তোমার মুখে এই কথাটা শোনবার জন্যই আমি ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছি—বলো রতি, একি আমাদের মুক্তি নয়?

আরতি তার বড় বড় তুটি চোখ তুলে মনসিজের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার তুই চোখের কোল ভরে অশ্রুজল উথ্‌লে উঠেছে।

মনসিজ বিস্মিত হয়ে বললে—তুমি কাঁদছ রতি? কার জন্য কাঁদছ? আমার স্ত্রীর জন্য কি? কেন? কই, আমি ত কাঁদছি নি? তার জীবনের অসীম তুর্ভাগ্যের দিনগুলি সন্নিকট হবার আগেই সে সৌভাগ্যবতী স্বর্গে গিয়ে বেঁচেছে!

আরতির চোখের জল আর বাধা মানল না! তার তুই গণ্ড বেয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়তে শুরু হল।

মনসিজ অস্থির হয়ে উঠে বললে—তবু তুমি তার জন্য কাঁদছ?

আরতি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—যারা চলে গেল এ মাটির মায়া ছেড়ে, আমি তাদের জন্য কাঁদিনি বন্ধু, আমি কাঁদছি যারা পড়ে রইল এখানে অসহায়—তাদেরই জন্য। তোমার সাধ্বী পত্নীর এই আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা পরস্পরে দাম্পত্য মিলনে আবদ্ধ হবার সুযোগ

এ জীবনের মতো হারালুম। পরলোকগত সতীর অশরীরি আত্মা যে মিলনের মধ্যে অহরহ আর্ত্তনাদ করে উঠবে তুমি কি তা সইতে পারবে বন্ধু ?

সর্পদষ্টের মত বিদ্যুৎ বেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে চীৎকার করে বলে উঠল মনসিজ……না—না—না—আমি তা পারবনা—পারবনা রতি, মৃতকে আমি বঞ্চিত করে বাঁচতে চাইনা, আমি চল্লুম।

দুই হাত জোড় করে শ্রদ্ধাভরে কপালে ঠেকিয়ে আরতি বললে—"এস বন্ধু ! তোমায় নমস্কার !"

অবর্ত্তমান

: বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ কার্য্য করেননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো যে, ব্যাপারটা ঠিক কি জাতীয়। ধূ ধূ করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউ গাছের ঝোপ, একধার দিয়ে শীতের শীর্ণ গঙ্গা বইছে। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকাল বেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চলে এসেছি তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ধ'রে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রাম হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি আধটি নয়, তিনটী নেশা আছে আমার। ভ্রমণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখী পাওয়া যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে করে' বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না

যে আমি মাংস খাবার লোভেই পাখী মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলু-ভাতে ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম তখন হতাশ হয়ে পড়তে হল আমাকে। কোথায় পাখী! ধূ ধূ করছে বালির চড়া আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখী কোথায়! বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয় চখার শব্দ ঠিক সে রকম নয় তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলুম চখা আছে কোথাও কাছে-পিঠে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে—কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম মাত্র একটী দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম দম্পতীর একটিকে কোন শিকারী আগেই শেষ করে গেছেন। এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বেশ খানিকটা দূরে। আমি আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব আর অমনি কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে হলে ধৈর্য্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল! আমিও বসলাম। উপর্য্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরে উঠলাম আবার। আবার

ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম কিন্তু উল্টো দিকে। পাখীটা মনে করুক যে আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ওধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছু দূর ঘুরতে হল—প্রায় মাইল খানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ্ করে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব আর অমনি—

কাঁআঁ—

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধরে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোক চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখীটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়ল না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় বসে রইল। মনে হল অসম্ভব বুঝি বা সম্ভব হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল যার কাছে-পিঠে কোন আড়াল আব্ডাল নেই—চতুর্দ্দিকেই ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হল। এবার গিয়ে বেশ ভাল জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্য্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে ঝাপে যা' দুএকটা ছোট পাখী ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা

থিতুতে আধঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

—আমি বসেছিলুম একটা বালির ঢিপির উপর, মুশকিল হল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না, বালির স্তর দিয়ে কোন রকম স্পন্দনই গিয়ে পৌছল তার কাছে তা বলতে পারিনা। উঠে দাঁড়ালাম। রোক আরও চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখীটা ওপারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্তটা দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিইনি—ও-ও আমাকে বিশ্রাম দেয়নি। এখন দুজনে দুপারে। চুপ করে বসে রইলাম।

সূর্য্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্য্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত জ্বলন্ত লাল দেখাচ্ছিল সূর্য্য ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ী ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানিনা।

ঘুরে বেড়াচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্য গগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ

ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ করে, বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়িনি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ মন সত্তা অধিকার করে বসল। আমি মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম। মনে হল কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়েনি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমারই চোখে পড়েনি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হ'ল আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোনও সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি সখ ছিল ভ্রমণ, সঙ্গীত শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেণে ষ্টীমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি, কিন্তু তাকে কি ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্ত-প্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে, তরঙ্গে হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তুষার পর্ব্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম তাহলে আর কি হল! সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে, কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণ-গম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে।

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়ছিল; কিন্তু ঠিক সেই সুরটি ফুটল না যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর ব্যক্তির নির্জ্জন-রোদনের অবাঙ্‌ময় বেদনা মূর্ত্ত হয়। শিকারই বা কি এমন করেছি জীবনে? সিংহ হাতী বাঘ গণ্ডার কিছুই মারিনি। মেরেছি পাখী আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপরে চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখীরা সাধারণতঃ রাত্রে তো ওড়ে না—হয়ত ভয় পেয়েছে কোনরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআ—

আরও খানিকটা নেবে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার ক'রে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখীটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম ভেসে যাচ্ছে।

—যাক্। জীবনে যা বরাবর হয়েছে এবারও তাই হল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনই কিছু পাইনি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ করে বসে ছিলাম।

চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোন কিছুর কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজু দেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে এসে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখনই বা নদীতে নাবলেন, কিছুই দেখতে পাইনি।

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কে?"

লোকটি এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্যই করেননি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন—"আমি এখানেই থাকি। আপনিই আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।"

পরিচয় দিলাম।

"ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।"

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূর গিয়েই দেখি একটি ছোট্ট কুটীর। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরে বেরিয়েছি, এটা চোখে পড়েনি আমার। ছোট্ট কুটীরটি যেন ছবির মতন—সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ—চতুর্দ্দিকে রজনীগন্ধার গাছ—অজস্র ফুল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধার ঊর্দ্ধমুখী বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভিতরে ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্জি গোছের কি একটা পাততে লাগলেন।

"বসুন"

বসে দেখলাম শতরঞ্জি নয়—গালিচা। খুব দামী নরম গালিচা। তিনিও একপ্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য আমার কৌতূহল ক্রমশঃই বাড়ছিল। তবু কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলাম, তিনিও চুপ করে রইলেন। শেষে আমাকে কথা কইতেই হল।

"সমস্তদিন এ অঞ্চলে ঘুরেছি কিন্তু আপনার দেখা পাইনি কেন ভেবে আশ্চর্য্য লাগছে।"

"সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায়?"

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হল—চোখ দুটো জ্বলছে—মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

"একটা গল্প শুনুন তাহলে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনেছেন?"

"না।"

"শোনবার কথাও নয়। দুজন রামপ্রতাপ ছিল—দুজনেই জমিদার —একজন সুদ-খোর আর একজন সুর-খোর।"

"সুরখোর?"

"হ্যা—ও রকম সুর-পাগল লোক ও অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়ীতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গান বাজনা শিখেছিলুম। বাংলাদেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয়নি তাঁর কাছে—গাড়ীতে একজনের মুখে কথায় কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিগ্যেস করি তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু তা না করে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর একজনকে জিগ্যেস করলুম—রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন। তিনি বলে দিলেন সুদ-খোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি ষ্টেশনে নেবে দশ ক্রোশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশ্যে। ডানকুনি ষ্টেশনে যখন নাবলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও

চৌতারা লোকজন—কোথাও কিচ্ছু নেই—ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি।”

“একা? কি রকম?” —সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

“হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদখোর ব্যাটা। তার বাড়ীর পথই সবাই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বখ্‌শিষ দিয়ে গেলেন।”

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—“গান শুনবেন?”

“যদি আপনার অসুবিধে না হয়—”

“অসুবিধে আবার কি। সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জ্জনবাস করছি—”

আবার উঠে গেলেন। কুটীরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বার করে বললেন—“বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।”

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনও শুনিনি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারিনি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা-ও জানিনা, ঘুম ভাঙল যখন, তখন দেখি আমি সেই ধূ ধূ বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চরে' বেড়াচ্ছে, মরেনি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলাম। শিকার উপলক্ষ্যেই আমরা এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্পটি আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর ?"

"তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—"

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া দেখিলাম—কেহ নাই।

ডাকবাংলোর চাপরাশিকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথাকার লোক। চাপরাশি উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোন লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড় একটা আসিতে চায়না—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

অপর্ণার উদ্দেশে

আই. এ. পাশ ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন ভর্তি হ'লাম সেদিন মনে ভারি ফুর্তি হ'লো। বাস্‌রে, কত বড়ো বাড়ি! করাইডরের এক প্রান্তে দাঁড়ালে অন্য প্রান্ত ধূ ধূ করে। ঘরের পরে ঘর, জমকালো আপিশ, জমজমাট লাইব্রেরি, কমনরুমে ইজিচেয়ার, তাসের টেবিল, পিং-পং, দেশবিদেশের কত কাগজ—সেখানে ইচ্ছামতো হল্লা, আড্ডা, ধূমপান সবই চলে, কেউ কিছু বলে না। কী যে ভালো লাগলো বলা যায় না। মনে হ'লো এতদিনে মানুষ হলুম, ভদ্রলোক হলুম। এত বড়ো একখানা ব্যাপার—সেখানে ডীন আছে, প্রভস্ট আছে, স্টুঅর্ড আছে, আরো কত কী আছে! যেখানে বেলাশেষে আধ মাইল রাস্তা হেঁটে টিউটরিঅল ক্লাশ করতে হয়, তারও পরে মাঠে গিয়ে ডনকুস্তি না-করলে জরিমানা হয়. যেখানে পর্সেণ্টেজ রাখতে হয় না, অ্যানুএল পরীক্ষা দিতে হয় না, যেখানে আজ নাটক, কাল বক্তৃতা, পরশু গানবাজনা কিছু-না-কিছু লেগেই আছে, রমনার আধখানা জুড়ে যে বিদ্যায়তন ছড়ানো, সেখানে আমারও কিছু অংশ আছে, এ কি কম কথা! অধ্যাপকরা দেখতে ভালো, ভালো কাপড়চোপড় পরেন, তাঁদের কথাবার্তার চালই অন্যরকম, সংস্কৃত যিনি পড়ান তিনিও বিশুদ্ধ ইংরেজি বলেন—ঘণ্টা বাজলে তাঁরা যখন লম্বা করাইডর দিয়ে দিগ্বিদিকে ছোটেন, তাঁদের গম্ভীর মুখ আর গর্বিত চলন দেখে মনে হয় বিশ্বজগতের সমস্ত দায়িত্বই তাঁদের কাঁধে

ন্যস্ত। এ সব দেখে শুনে আমারও আত্ম-সম্মান বাড়লো, এ সংসারে আমি যে আছি সে বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন হ'য়ে উঠলুম। মন গেলো নিজের চেহারার দিকে, কেশবিন্যাস ও বেশভূষা সম্বন্ধে মনোযোগী হলুম। শার্ট ছেড়ে পাঞ্জাবি ধরলুম, সদ্যোজাত দাড়িগোঁফের উপর অকারণে ঘন-ঘন ক্ষুর চালিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই মুখমণ্ডলে এমন শক্ত দাড়ি গজিয়ে তুললুম যে আজ পর্যন্ত কামাতে ব'সে চোখের জলে সে স্বকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তখন অবশ্য ভবিষ্যতের ভাবনা মনে ছিলো না, বালকত্বের খোলশ ছেড়ে খুব চটপট যুবা বয়সের মূর্তি ধারণ করাই ছিলো প্রধান লক্ষ্য।

এর অবশ্য আরো একটু কারণ ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ছাত্রীও ছিলেন। ওখানকার নানারকম অভিনবত্বের মধ্যে এ-জিনিসটাই ছিলো আমার চোখে—প্রায় সব ছেলেরই চোখে—সব চেয়ে অভিনব। যখনকার কথা বলছি, তখনও মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বান ডাকেনি, সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঁচটি কি ছ'টি মেয়ে ছিলো সব সুদ্ধ। আমাদের সঙ্গে অপর্ণা দত্ত নামে একজন ভর্তি হয়েছিলো।

পাৎলা ছিপছিপে মেয়ে, শ্যামল রং, ফিকে নীল শাড়ি প'রে কলেজে আসতো। দু'শো ছেলের সঙ্গে ব'সে একটি মাত্র মেয়ের বিদ্যাভ্যাস ব্যাপারটা বিশেষ সোজা নয়, বিশেষত যখন ক্লাশে ছাড়া আর সবখানেই ছেলেদের থেকে তাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক'রে রাখার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা থাকে। অপর্ণার কেমন লাগতো জানি না, কিন্তু আমার ওর জন্য দুঃখ হ'তো। ছেলেদের মধ্যে ওকে নিয়ে নানারকম আলোচনা শুনতুম, তার সবগুলো বলবার মতো নয়। তাদের ভদ্রতার আদর্শ সমান ছিলো না। মনের মধ্যে যে-চাঞ্চল্যটা স্বাভাবিক কারণেই হ'তো, সেটাকে ব্যক্ত

করবার উপায়ও ছিলো এক-এক জনের এক-এক রকম ; বেশির ভাগ শুধু কথা ব'লেই খুশি থাকতো—অর্থাৎ জীবনে যা ঘটবার কোনো সম্ভাবনাই নেই সে-সব নিজের মনে কল্পনা ক'রে নিয়ে গল্প করতো ; কয়েকজন দুঃসাহসী কোনো-না-কোনো অছিলায় মেয়েদের কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে অপর্ণার সঙ্গে আলাপ ক'রে এলো ; আর কেউ-কেউ ছিলো একেবারে চুপ। ব'লে রাখা ভালো, আমি ছিলুম এই শেষের দলে। ক্লাশে আমি বসতুম একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে ; অনেকগুলো কালো মাথার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ কখনো-কখনো অপর্ণাকে আমার চোখে পড়তো —তার স্বতন্ত্র চেয়ারে ব'সে খোলা বইয়ের দিকে তাকিয়ে একটি হাত গালের উপর। ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো সেই মুখ, বসবার সেই ভঙ্গিটি আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিলো, এখনো মনে করতে পারি। সরু হাতে একটি মাত্র চুড়ি, মাথার কাপড়ের চওড়া সবুজ পাড় মুখখানাকে ঘিরে রয়েছে। লক্ষ্য করতুম অপর্ণা আগাগোড়া বইয়ের উপরেই চোখ রাখতো, যেন অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে নিজেকে দিয়েই নিজেকে রাখতে চাইতো আড়াল ক'রে। শুধু মাঝে-মাঝে অতগুলো কালো মাথা ভেদ ক'রে ওর চোখের দৃষ্টি আমারই মুখের উপর যেন পড়তো। তবে এটা খুব সম্ভব আমার কল্পনা।

চার বছর অপর্ণা ছিলো আমার সহপাঠিনী, কিন্তু তার মধ্যে এইটুকুই আমার সঙ্গে ওর পরিচয়। সে-চার বছরে ওর কণ্ঠস্বর পর্যন্ত আমি কোনোদিন শুনিনি, মুখোমুখি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ওকে দেখিনি কখনো। ও-সব পুরস্কারলাভের জন্য আমার চেয়ে যোগ্য অনেকেই ছিলো। তার মধ্যে অশোক ছিলো পয়লা নম্বর। অশোক কাপ্তেন গোছের ছেলে, বাপের দেদার পয়সা, মোটারবাইকে চ'ড়ে কলেজে আসে, শীতকালে

ফ্ল্যানেলের পাৎলুন আর বিলেতি শার্ট পরে, সিগারেট নিজে খায় যত, বিলোয় তার বেশি, সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে নিঃসন্দেহে সে সব চেয়ে পপুলর। চমৎকার চেহারা, তাছাড়া গুণও তার অনেক। টেনিস খেলতে পারে, অভিনয় করতে পারে, সাইকেল চালাতে অদ্বিতীয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। হল্-এর ড্রামাটিক সেক্রেটারি থেকে আরম্ভ ক'রে ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের সেক্রেটারি পর্যন্ত যেটার জন্যই যখন দাঁড়িয়েছে, অসম্ভব রকম বেশি ভোট পেয়ে অনায়াসে হ'য়ে গেছে। সত্যি বলতে, ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার মতো ছেলে আর ছিলো না।

এই অশোকের কাছে অপর্ণার কথা অনেক শুনতুম। সে তুখোড় ছেলে; কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দু' মিনিট আলাপ ক'রেই তৃপ্ত হয়নি, গেছে অপর্ণার বাড়িতে, চা খেয়েছে, তার মা-কে মাসিমা ডেকেছে, তার বাবার সঙ্গে পলিটিক্স চর্চা করেছে, ভাই-বোনদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, এক কথায়, যা যা করা দরকার সবই করেছে। এক বছরের মধ্যে এই ভাগ্যবান পুরুষ এমন জমিয়ে তুললো যে অন্য ছেলেরা তাকে মনে মনে ঈর্ষা ও বাইরে খোশামোদ করতে লাগলো—যদি তার সূত্রে তারাও সেই অমরাবতীর কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। কিন্তু অন্য সকলকে অগ্রাহ্য ক'রে অশোক গায়ে প'ড়েই আমার কাছে শুধু ঘেঁষতো, তার কারণ বোধ হয় এই যে আমি ছিলুম আদর্শ শ্রোতা, আমার কাছে মনের সমস্ত কথা উজোড় ক'রে ঢেলে সে ভারি আরাম পেতো। কতদিন আমাকে নিয়ে ক্লাশ পালিয়েছে, শীতের সুন্দর দুপুরবেলায় ঘাসের উপর ব'সে আমাকে শুনিয়েছে অফুরন্ত অপর্ণা-চরিত। এ-ধরনের গল্প সাধারণত ক্লান্তিকরই হয়, কিন্তু আমি স্বীকার করবো যে, আর কিছু না হোক্, বার-বার ঐ অপর্ণা নামটি শুনতেই আমার ভালো লাগতো।

সব কথার শেষে অশোক আমাকে প্রায়ই বলতো, 'চলো না তুমি একদিন ওদের বাড়ি।'

আমি বলতুম, 'পাগল !'

'ও চায় তোমার সঙ্গে আলাপ করতে। ডক্টর করের সঙ্গে ও টিউটরিয়ল করে, তিনি ওকে প্রায়ই বলেন কিনা তোমার কথা।'

এখানে লজ্জার সঙ্গে ব'লে রাখি লেখাপড়ায় বরাবরই আমি একটু ভালো। আত্মীয়রা আশা করেছিলেন হোমরা-চোমরা মস্ত চাকুরে হ'বো, কিন্তু কিছুই হ'লো না, সামান্য মাষ্টারি ক'রে পেট চালাই।

অশোকের কথা আমি রাখিনি, একদিনও যাইনি ওর সঙ্গে অপর্ণার বাড়ি। অপর্ণার সঙ্গে আলাপ করবার লোভ আমার ছিলো না এমন অসম্ভব কথা আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না। খুবই ছিলো। কিন্তু অত্যন্ত লাজুক হ'লেও ভিতরে-ভিতরে ছিলাম আমি গর্বিত। অশোকের মধ্যস্থতায় অপর্ণার সঙ্গে আলাপিত হওয়া আমার পক্ষে অপমান। আমিই বা ওর চেয়ে কম কিসে! তাছাড়া ছাত্রজীবনের নানারকমের কাজে ও অকাজে, দিন ভ'রে আড্ডা আর রাত জেগে পড়ায় এত ব্যস্ত ছিলুম যে তার মধ্যে অপর্ণার কথা ভাববার খুব বেশি সময় ছিলো না, সত্যি বলতে।

হু-হু ক'রে দিন কাটতে লাগলো, বি. এ. পরীক্ষা হ'য়ে গেলো। আমার বিষয় ছিলো দর্শন, আজগুবি রকমের ভালো নম্বর পেয়ে ফর্স্ট্ ক্লাশে উৎরে গেলুম। অপর্ণা আর অশোক দু'জনেই ছিলো পাস-কোর্সে, এম. এ.-র শেষ বছরে এসে অপর্ণাকে একটু কাছাকাছি দেখবার সুযোগ পেলুম, কারণ সে-ও দর্শনে এম. এ. নিয়েছিলো। মডর্ন ইয়ং ম্যান অশোক নিয়েছিলো ইকনমিক্স, কিন্তু অধ্যয়নের ব্যবধান ডিঙিয়ে সে সমীপবর্তিতার

মৌরশিপাট্টার ব্যবস্থা ক'রে এনেছিলো। একদিন খুব চুপে-চুপে আমাকে বললে কথাটা। সবই ঠিকঠাক, এম. এ.টা হ'য়ে গেলেই হয়।

পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে দর্শনের বাজার-দর তখন থেকেই নামতে শুরু করেছে। সবসুদ্ধ আমরা সাতজন ছিলাম ক্লাশে, ছ'টি ছেলে ও একটি মেয়ে। আলাপ করবার অবারিত সুযোগ ছিলো। পড়াশুনোয় সাহায্য করবার অছিলা ছিলো হাতের কাছেই, আর আমার মুখে সেটা ফাঁকা বুলিও শোনাতো না। কিন্তু যখনই আমার কথাটা মনে হ'তো তখনই আমার ভিতর থেকে কে আর-একজন ব'লে উঠতো—'তুমি গিয়ে কারো সঙ্গে যেচে আলাপ করবে—ছি!'

এদিকে অশোক আমাকে বড়োই পিড়াপিড়ি করতে লাগলো অপর্ণাদের বাড়ি যাবার জন্যে। কাণ্ট বড়োই দুর্বোধ ঠেকছে অপর্ণার, আমার সাহায্য দরকার। আমি হেসে বললুম, 'বড়ো-বড়ো বিদ্বান মাষ্টার মশাইদের মুখে শুনে যা সরল হচ্ছে না, তা কি বোঝাতে পারবো আমি!' আর-একদিন অশোকের হুকুম, হেগেল সম্বন্ধে আমার কী-কী নোট আছে দিতে হবে। শুনে মনে হ'লো, হায় হায়, কেন অন্য ছেলেদের মতো নোট রাখিনি! কিন্তু আমার যে কোনো নোটই নেই এ-কথা অশোক বোধ হয় বিশ্বাস করলে না; ভাবলে পরীক্ষা-সংক্রান্ত আমার সব গোপনীয় তুকতাক ফুসমন্তরে আমি অন্য কাউকে অংশী করতে চাই না। যাই হোক্, অপর্ণার হ'য়ে অশোক আমাকে পড়াশুনো বিষয়ে কোনো কথা আর জিজ্ঞেস করেনি।

অতএব দর্শনের ছোটো ক্লাশে দুটো বেঞ্চির ওপারে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছরটা কাটলো। আমার

মনে হ'তো, অপর্ণা আমার দিকে ঘন-ঘনই তাকাচ্ছে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আমার মনের ভুল।

এম. এ. পরীক্ষা হ'য়ে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদায় দিয়ে বেকার-বাহিনীতে ভর্তি হবার সময় যখন ঘনাচ্ছে, এমন সময় অশোক একদিন আমার বাড়ি এসে সুখবর দিয়ে গেলো। তারিখ পর্যন্ত ঠিক। আজ সন্ধ্যায় কন্যার আশীর্বাদ উপলক্ষ্যে অপর্ণাদের বাড়িতে উৎসব, আমি যেন অবশ্য যাই।

আমি তক্ষুনি বললুম, 'যাবো।' আমার হঠাৎ মনে হ'লো আজ আর আমার যাবার কোনো বাধা নেই, যদিও এতদিন যে কী বাধা ছিলো তা আমিও জানি না।

এই প্রথম আমি অপর্ণাকে কাছাকাছি দেখলুম, তার কথা শুনলুম। কিন্তু সেদিন তার সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি, কপালে চন্দন, পরনে খয়েরি রঙের রেশমি শাড়ি, গা ভরা গয়না, চেনাই যায় না। যে-ঘরটায় গিয়ে বসলুম সেখানে অনেক লোক। অধিকাংশই আমার অচেনা, সুতরাং জড়োসড়োভাবে চুপ ক'রে রইলুম।

অশোক এক সময়ে আমার কাছে এসে চুপি-চুপি বললে, 'এখানে তোমার ভালো লাগছে না, বুঝেছি। চলো আমার সঙ্গে।'

নিয়ে গেলো আমাকে পাশের একটি ছোটো ঘরে, অপর্ণার পড়ার ঘর সেটা। চারদিকে দর্শনের বই দেখে খানিকটা আরাম পেলাম। আমাকে বসিয়েই অশোক যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'লো, ভারি ব্যস্ত সে। একা ব'সে আমি একটি বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলুম।

মৃদু শব্দ শুনে চমকে চেয়ে দেখি অপর্ণা আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে। সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালুম, কী বলবো ভেবে পেলুম না।

অপর্ণাই প্রথমে কথা বললে, 'এতদিনে আপনি এলেন!'

আমি বললুম, 'আমার অভিনন্দন আপনাকে জানাই।'

'এতদিন আসেননি কেন ?'

'আসিনি—আসিনি—তার মানে—আসা হয়নি আরকি।'

'অশোক আপনাকে বলেনি আসতে ?'

'বলেছে।'

'আপনি কি ওর কথা বিশ্বাস করেননি ?'

'অবিশ্বাস করিনি, তবে—'

'তবে আমার সঙ্গে আলাপ করবার আপনার কোনো ইচ্ছে হয়নি, এই তো?'

'না—না—ইচ্ছে হবে না কেন।'

অপর্ণা একটু মুচকি হেসে বললে, 'থাক, এখন আর ভদ্রতার শুকনো কথা ব'লে কী লাভ—এখন তো আর সময় নেই।'

শেষের কথাটা শুনে হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। অপর্ণা স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি বুঝি ভেবেছিলেন অশোকই আমার লক্ষ্য ছিলো ? এই চার বছরে অশোককে দিয়ে এতবার আপনাকে খবর পাঠালুম, আমলেই আনলেন না !' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ মাথা নেড়ে খুব নিচু গলায় বললে, 'কিচ্ছু বোঝেন না !' সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলুম অপর্ণার দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু সেটাও বোধ হয় আমার কল্পনা।

বাড়ি ফিরে অনেক রাত অবধি ঘুমুতে পারলুম না, হয়তো তার একটা কারণ অন্যমনস্কভাবে ও বাড়িতে অত্যন্ত বেশি খেয়ে ফেলেছিলুম। শুয়ে-শুয়ে অনেক কথা মনে পড়লো, অনেক কথা মনে হ'লো। অপর্ণার কথাগুলি বিষাক্ত পোকার মতো মগজের মধ্যে কামড়ে ফিরতে লাগলো।

ডালি

ভাবনাগুলো যেখান থেকেই শুরু হয়, খানিক পরেই এক অন্ধ গলির সামনে এসে পড়ে, তার পর আর রাস্তা নেই। আমি যে কত বড়ো বোকা তা উপলব্ধি ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। কী হ'তে পারতো, কী না হ'তে পারতো—সব নষ্ট করলুম আমি। অন্ধকারে চোখ মেলে নিজের মনে বার-বার বললুম, ও আমাকেই চেয়েছিলো, আমাকেই চেয়েছিলো, হয়তো এখনো—না, না, এখন আর সময় নেই, আর সময় নেই।

কয়েকদিন পরেই অপর্ণার বিয়ে হ'য়ে গেলো, আর আমি চ'লে এলুম কলকাতায় চাকরির চেষ্টায়।

দশ বছর কেটে গেছে। আমি এখনো বিয়ে করিনি, তার কারণ আমার ক্ষীণ আয়ের উপর মা-বাবা ভাইবোনের নির্ভর, আমি বিয়ে করলেই তাদের ভাগে কম পড়বে, অতএব সে-বিষয়ে সকলেই উদাসীন। অশোক ঢুকেছিলো ইনকম-ট্যাক্সে, এতদিনে নিশ্চয়ই অফিসার হ'য়েছে, হয়তো রংপুরে, হয়তো বরিশালে, হয়তো চাটগাঁয়ে হাকিমি করছে। আমার জীবন অত্যন্ত শান্ত ও নিয়মিত; কোনো আক্ষেপ, কোনো উচ্চাশা কোনো কল্পনা নেই। দর্শন পড়ি ও পড়াই, নিছক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকেই জীবনের একমাত্র সুখ ব'লে মেনে নিয়েছি। ভালোই আছি।

শুধু মাঝে-মাঝে অনেক রাত্রে সেই একটি তরুণ শ্যামল মুখ মনে পড়ে, সরু হাতে একটিমাত্র চুড়ি, সবুজ পাড় মাথাটিকে ঘিরেছে। অন্ধকারে কে যেন চুপি-চুপি কথা বলে—'এত দেরি ক'রে এলেন—আর তো সময় নেই।'

(অপর্ণা, তুমি কোথায়?)

স্বপ্নের সমাধি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভীষণ পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেল লাইন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেবার।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের সারেণ্ডা ডিভিজনের অরণ্যানী সমগ্র সিংভূম জেলার মধ্যে নিবিড়তম ও ভীষণতম। বিখ্যাত সারেণ্ডা টানেল যখন তৈরি হয়, তখন যে-ক'জন ছোট কণ্ট্রাক্টর কাজ করতো, তার মধ্যে আমিও ছিলাম।

আমার এই কথাটা কোথাও না কোথাও লেখা থাকা দরকার। দু'তিন পুরুষ পরে এ সব কথা কেউ জানবেও না, শুনবেও না। আমি যে সময়ের কথা বলচি, সে এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা, তখন আমার বয়েস ছাব্বিশ সাতাশ—আমার কাকার মামাশ্বশুর বি, এন, রেলের কনণ্টাক্‌শনের মধ্যে বড় চাকুরী করতেন, তিনিই আমাকে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন।

সে সময়ের সারেণ্ডা অরণ্যের ছবি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকবে। সে উত্তুঙ্গ শৈলমালা, পার্ব্বত্য ঝর্ণা, সে বিট্‌কেল মশার ঝাঁক, বিষধর সর্পসঙ্কুল গহন-গভীর বনভূমির গম্ভীর দৃশ্য, সে বনহস্তীযূথ সারেণ্ডা অঞ্চলে এখনও আছে জানি—তবুও পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বের সে সারেণ্ডা তার সমুদয় ভীষণতা নিয়ে এখন যে আর বর্ত্তমান নেই, একথা খুবই ঠিক।

ডালি

১৮৯২ সালের ১২ই মার্চ্চ আমি প্রথম কাজে যোগ দিই।

তখন সেই বিশাল প্রাচীন অরণ্যানীতে বসন্ত নেমেছিল। শিবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজের হোষ্টেলের ঘর থেকে একেবারে গিয়ে পড়লাম সেই বসন্ত উৎসবে মত্ত বনানীর মধ্যে। তার আগে দুবার কলেজের পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় অভিভাবকেরা আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বাবা ছিলেন না, জ্যাঠামশায় ও দুই কাকা ঘাড়ের বোঝা নামাবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে ছোট কাকার মামাশ্বশুর রায় বাহাদুর ৺চূনীলাল মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে এ অধমকে সিংভূমে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে চালান করে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম বনের মুক্ত হাওয়ায় প্রস্ফুটিত ধাতুপ্‌ ও পলাশ ফুলের শোভার মধ্যে হোষ্টেলের বাঁধাধরা আইনকানুন ছাড়িয়ে এসে।

সারেণ্ডা টালেন তখন কাটা আরম্ভ হয়েচে দুদিক থেকে—ওদিকে হাত দশেক, এদিকে হাত দশেক কাটা হয়েচে। আমি থাকি কলকাতার দিকে—আর বম্বের দিকে থাকতেন কালীভৈরব চক্রবর্ত্তী বলে আর একজন সাব-কণ্টাকটর, আর তাঁর উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে সিধু। এদিক থেকে ওদিকে যাবার পথ ছিল পাহাড়ের উপর ঘন বনের মধ্যে দিয়ে বলে সন্ধ্যার পর সাধারণতঃ উভয় দিকের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেতো। সারেণ্ডা অঞ্চলের বাঘ যেমন বড়, তেমনি হিংস্র প্রকৃতির। কালীভৈরব চক্রবর্ত্তী বৃদ্ধলোক, বয়েস পঞ্চান্ন ছাপান্ন—বাড়ী খুলনায়। অবস্থা খুব ভাল নয়, কোনরকমে কায়ক্লেশে কিছু টাকা যোগাড় করে সেই বয়েসে ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে বেরিয়েছিলেন, ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে। দেশে এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া তাঁদের আর কেউ ছিল না—চক্রবর্ত্তী

মহাশয়ের স্ত্রী ওই একমাত্র পুত্রটির শৈশবাবস্থায় মারা যান। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর বিবাহ করেননি।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন অতি নিরীহ, সাধুপ্রকৃতির লোক—তাঁর মত ভাল মানুষ লোকের এ কাজে লাগা উচিত হয়নি। রেলপথ নতুন তৈরি হচ্চে, কাঁচা পয়সার বাজার, ভারা বাঁধবার বাঁশ সরবরাহ করে সাতুলাণ মাগ্‌নিয়া নামক জনৈক হিন্দুস্থানী অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিল ক'মাসের মধ্যে—সেস্থলে কালীভৈরব চক্রবর্ত্তী কুলিদের দৈনিক হাজিরা বই নিখুঁত ভাবে লিখতেন। প্রত্যেক শালের গুঁড়ি আলকাৎরা দিয়ে চিহ্ন করে রাখতেন, পাছে কোম্পানীর মাল তছরূপ হয়। এরকম লোকের কন্‌ষ্ট্রাক্‌শনে নামা উচিত হয়েছিল কিনা আপনারা বলুন।

বেলা দশটা।

আমি তাঁবুর বাইরে বসে সাহেবের হুকুমে পাথরের হিসেব তৈরি করচি—এমন সময় চক্রবর্ত্তী মশায় টানেলের ওদিক থেকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে এসে হাজির হলেন।

আমায় বল্লেন—ননীবাবু একটা অঙ্ক কসে দিতে হবে যে—

—কি অঙ্ক? আসুন বসুন চক্কত্তি মশায়—চা আনাই—

এই দেখুন এই কিউবিক ফুট ধরে হিসেব করলাম তাও মিলচে না, স্কোয়ার ফুট ধরে হিসেব করি তাও মিলবে না—

সাহেব ওবেলা তদারকে বেরোবে, হিসেব পেশ না করলে জরিমানা করে বসবে ব্যাটা।

আমি হেসে বল্লাম—যা পন্থ মিলে যা গোছের করলে হবে কেন? কিউবিক ফুটে না মিললো তো স্কোয়ার ফুট ধরলেন, অমন করে কি অঙ্ক কষা যায়? বসুন চা খান।

একজন কুলী আমার ইঙ্গিতে চা তৈরী করে নিয়ে এল। চক্রবর্ত্তী মশায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বল্লেন—আর ভাই, এই জঙ্গলে একটা বাঙালীর মুখ দেখার যো নেই, শুধু কুলীদের নিয়ে কাজকর্ম্ম, একেবারে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তবুও ছেলেটা আছে তাই রক্ষে। মাঝে মাঝে কাজের ছুতো করে আসি, বিরক্ত হও না তো?

আমি শশব্যস্ত হয়ে বল্লাম—সে কি কথা? যখন হয় আসবেন—আমার নিজেরও তো সেই অবস্থা।

চক্কত্তি মশায় বল্লেন—এক একদিন রাত্তিরে মন এমন খারাপ হয়—কোথায় পড়ে আছি বাপ ব্যাটায় দুটো ভাতের অভাবে। সেদিন বাঘ তো তাঁবুর দোরগোড়ায় এসেছিল রাতদুপুরের সময়। আর একটু হোলে যেতাম বাঘের পেটে। এত বিশ্রী বাঘও আছে এ অঞ্চলে!

—সন্ধের দিকে আসেন না কেন?

—ও বাবা, ওই পাহাড়ের ওপরের জঙ্গল দিয়ে বেলা পাঁচটার পর কি আসা যায়—এই বাঘের দেশে! নইলে ইচ্ছে তো করে। আবার রাতে ফিরতে হলেই গিয়েছি!

—এখানে রইলেন রাতটুকু—ফিরবেন কেন?

—সে হয় না। ছেলেটা একা তাঁবুতে থাকবে বনের মধ্যে। ওর জন্যেই আমার যা কিছু করা। ওই ছেলেকে কত কষ্টে মানুষ করেছি ওর গর্ভধারিণী মারা যাওয়ার পরে। হাতে পয়সা-কড়ি কিছু নেই—অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েচে। তবুও যদি ছেলেটার কিছু করে দিতে পারি ভবিষ্যতের—এই উদ্দেশ্যেই জমিজমা যা কিছু ছিল বিক্রি করে এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে এসে পড়ে আছি। শুধু ছেলেটার আখেরে যদি কিছু হয়—এই জন্যে।

চক্রবর্ত্তী মশায়কে ভাল লাগতো। এই বয়সে ভদ্রলোক পয়সার জন্যে এত দূর-দেশে পড়ে আছেন, বৃদ্ধের ওপর সহানুভূতিও হোত। যেদিনই আসতেন আমার এখানে না খাইয়ে ছেড়ে দিতাম না। আজও তাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করলাম। বৃদ্ধ খুব খুসি। আমায় বল্লেন—তবুও একটু মুখ বদলানো। আমরা থাকি কাজে ব্যস্ত, এক উড়ে বামুন কুলীগিরি করে, তাকে রাঁধতে দিই। সে কোনকালে বাংলা মুল্লুকে যায়নি, সে যা রাঁধে! রামোঃ—

খাবার সময় বল্লাম—আমসত্ব খাবেন চকত্তি মশায়?

—আমসত্ব? বাঃ—কোথায় পেলেন? গিন্নী চলে গিয়ে এস্তোক্, ওসব বড় একটা অদৃষ্টে জোটেনি। কাগজে মুড়ে দিন, সিধুর জন্যে একটু নিয়ে যাবো—

আহারাদি সেরে বসে আছি দুজনে, এমন সময় খবর এল, ওপর পাহাড়ের বনে সাত নম্বর দলের একটা কুলীকে বাঘে নিয়েচে। সতেরো জন লোকের একটা দল বাঁ দিকের পাহাড়ে শালের খুঁটি কাটছিল, তাদের মধ্যে থেকে সিংভূমের দুর্দ্দান্ত বাঘ একজনকে নিয়ে চলে গিয়েচে। কুলীরা রিপোর্ট করে খালাস—কিন্তু এ বিষয়ে আমার দায়িত্ব অনেক জটিল। আমি বড় সাহেবের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে এগারো মাইল দূরবর্ত্তী বড় জমিদার পুলিশ ষ্টেশনে খবরটা পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। পুলিশের কর্ত্তারা এলে বনের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে যদি তাঁদের মর্জ্জি হয়।

জিগ্যেস্ করলাম—লাস পাওয়া গিয়েচে?

—না, হুজুর।

তবুও রক্ষা। লাস যদি মেলে, তো আরও বেশি হাঙ্গামা। কোথায় লাস

আনাও রে, সনাক্ত করাও রে—হয়তো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্যে এরা বড় সাহেবের কাছে দরখাস্তও পেশ করতে পারে। তার সাক্ষী-সাবুদ যোগাড়—সে বহু জটিল কর্ম্মধারার সরু জালে আটক পড়ে যেতে হবে।

চক্রবর্ত্তী মশায় বল্লেন—তাই তো, এলাম একটু নিরিবিলি গল্প-গুজব করব—আপনিও তো কম হাঙ্গামায় পড়লেন না দেখচি। তবে আমি আজ যাই—

—যাবেন তো কিন্তু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে—দলে পুরু না হয়ে যাবেন না। দাঁড়ান লোক সঙ্গে দিই—

গ্যাং সর্দ্দার ধনীরাম মারিফ এত্তেলা করলে পাহাড়ের উত্তর দিকের ঢালুতে ঝর্ণার ধারে কুলীটার অর্দ্ধভুক্ত লাস পাওয়া গিয়েচে।

আমি বল্লাম—ঐ শুনুন চক্কত্তি মশায়—যাও বা একটু সুখের আশা ছিল এইবার নির্ম্মূল। থানা-পুলিস নিয়ে এইবার বিব্রত যা হবার হতে হবে—

—আমি যাই ননীবাবু। ছেলেটা তাঁবুতে আছে, কুলীরা রাতে কেউ ওখানে থাকে না—ওদের কি একটা বস্তি আছে—সেখানে চলে যায়। হয়তো ছেলেটাকে একলা ফেলে হতভাগারা চলে যাবে এখন। আমি যাই—

জন চার পাঁচ কুলী যোগাড় করে দিলাম চক্রবর্ত্তী মশায়ের সঙ্গে। পুত্রস্নেহান্ধ বৃদ্ধ নিজের বিপদ তুচ্ছ করে সেই অবেলায় গভীর বনের মধ্যে দিয়ে সারেণ্ডা পাহাড়ের ওপারে রওনা হয়ে গেল।

পরদিন দুপুরে চক্কত্তি মশায় আবার এসে হাজির। বৃষ্টির জন্যে ধ্বস্ নামচে টানেলের মুখে। সাহেবের কাছে একটা রিপোর্ট করে দেব কি?

আমি বল্লাম—সাহেব থাকেন ত্রিশ মাইল তফাতে। আজ অবেলায় না জানিয়ে কাল যদি পাঠান ?

—বড্ড জরুরি।

—তা'হোলে আমি নিজেই ট্রলি করে রওনা হই—কি বলেন ?

চক্কত্তি মশায় আমায় নিষেধ করলেন। ঘন বনভূমির মাঝখান বেয়ে সুঁড়ি রেলপথ—অবেলায় সুমুখ আঁধার রাত্রে সে পথ দিয়ে ট্রলি চালিয়ে যাওয়া মানে বুনো হাতীর পায়ের চাপে পিষ্ট হওয়াকে স্বেচ্ছায় বরণ করা।

চক্কত্তি মশায় বল্লেন—তবে ফিরে যাই এই বেলা ?

—রাত্রে থাকবেন না ?

—না, ছেলেটার জন্যে কোথাও থাকতে পারিনে। বিদেশ বিভূঁই জায়গা, আর এই বাঘভালুকের উপদ্রব—

চক্কত্তি মশায়ের আসল কথাটা এখনও বাকি ছিল। যাবার সময় করুণভাবে আমায় জানালেন, কুলীদের মাইনে দেওয়ার জন্যে কিছু টাকা দরকার কাল সকালে—আমি কি কিছু পেতে পারি ?

দিলাম দশটা টাকা। সঙ্গে চার জন কুলী যাওয়ারও ব্যবস্থা করে দেওয়া গেল—চক্কত্তি মশায় চলে গেলেন।

সেই রাত্রে ভীষণ বৃষ্টি নামলো, সিংভূম অঞ্চলে বৃষ্টি নেই তো নেই—কিন্তু যদি একবার নামলো তবে পাঁচ ছ' দিনের মধ্যে আর থামবার নামটি করে না। বনের ঝর্ণা সব পরিপুষ্ট হয়ে উপলরাশির ওপর দিয়ে উদ্দাম নৃত্যছন্দে ছুটলো, কুরচি ফুলের সুবাসে আর্দ্র সজল বাতাস মাতাল হয়ে উঠলো, বন্য-ময়ূরদের কেকারব ধ্বনিত হতে লাগলো পাহাড়ের মাথায়—বনের এপারে পাহাড়ী কারো নদীতে গৈরিক জলের ঢল নামলো।

কাজকর্ম্ম সব বন্ধ। শ্রাবণ মাস শেষ হয় হয়—ভাদ্র মাস পড়তে আর বেশি বিলম্ব নেই—জঙ্গলে বড় বড় রক্তচোষা জোঁকের উৎপাতে কুলীর দল শালের লগ্ কাটা বন্ধ করার উপক্রম করলে। আর মশার কথা না তোলাই ভালো। সে রকম মশার বন্দনাও কেউ বাংলাদেশে থেকে কোনদিন করতে পারবে না। মশারি না খাটিয়ে সন্ধ্যার পরে আপিসের কাজকর্ম্ম করার উপায় নেই।

আর এক বিপদ—বর্ষা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবার জিনিসপত্রের ভয়ানক অনটন দেখা দিল। বড় জামদা'র হাট থেকে সাধারণত কুলীরা চাল ও তরিতরকারী কিনে আনতো—তাও ঢেঁড়স্ ও তেলাকুচো জাতীয় একপ্রকার ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না—এসময়ে আরও জিনিষপত্র অমিল হয়ে উঠলো।

কিন্তু আমার এই ঘন বর্ষা বড় ভাল লাগতো, সেই পর্ব্বত-অরণ্য অঞ্চলের বর্ষা কখনো দেখিনি তাই শাখা থেকে শাখান্তরে পতনশীল বারিধারার শব্দ আমাকে সব সময় মনে করিয়ে দিত, আমি প্রবাসী, ঘরবাড়ী ছেড়ে বহুদূরে আছি ; দূরের পর্ব্বত যেখানে ঘননীল দিগন্তে মিশে আছে, শ্যামল বনানী যেখানে আমার অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে রহস্যময় ব্যবধানের সৃষ্টি করেচে।—আমি মুক্ত, আমি একা—শিবপুর কলেজ হোষ্টেলের আইনের গণ্ডি আমাকে বাঁচাতে পারবে না এখানে। এমন সময় একদিন রাত্রে আলো জ্বেলে তিনজন কুলী ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে এসে উপস্থিত হোল টানেলের ওমুখ থেকে। আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো মন্সুখ বলে একজন মুণ্ডা কুলি—বাকি দুজন দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তখন দুদিনের বাসি খবরের কাগজখানা পড়ে ঘুম আনাবার চেষ্টা করছি, বল্লাম—কি রে মন্সুখ—

—বাবুজি, চক্কত্তি বাবুর একটা চিট্টি হাছে—

—এত রাত্তিরে?

—উঁয়ার ছেলের বড্ড বেমারি। আপনাকে এখুনি যাতি হোবে—

শুনে এবং চক্কত্তি মশায়ের চিঠি পড়ে প্রমাদ গণলাম মনে মনে। এই দুর্য্যোগের রাত্রে, শ্বাপদসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে ওপারে যাওয়া খুব আরামের জিনিস নয়। উপায় নেই, চিঠিতে জানা গেল চক্কত্তি মশায়ের ছেলের বড় অসুখ—এই বনের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো বাঙালী নেই আমি ছাড়া।

সঙ্গে নিলাম একটা সড়কি, দুজন লাঠিধারী সবল কুলী। টানেলের বাঁ ধার দিয়ে বেঁকে চারা শালজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ উঠে গিয়েচে পাহাড়ের ওপরে। সেখানে জঙ্গল ভীষণ ঘন, বনস্পতি জাতীয় বৃক্ষ আকাশ ঢেকে রেখেচে। এক এক জায়গায় ঘন লতাঝোপ, অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে, তাদের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় গা ছম্ ছম্ করে। ঘণ্টা খানেক অনবরত হাঁটবার পরে টানেলের ওমুখে পৌছে গেলাম। আর সে কি বৃষ্টি! সর্ব্বাঙ্গ ভিজে জল পড়ছে সারা গা বেয়ে।

ছোট্ট কুঁড়ে, শাল ও কেঁদপাতা ডাল শুদ্ধ ভেঙ্গে তাই দিয়ে ছাওয়া —দুটি খোপ—একটি খোপে চক্কত্তি মশায় ও তাঁর ছেলে, অন্যটিতে মনসুখ থাকে, ওর সঙ্গে থাকে ছেদিরাম মুণ্ডা বলে আর একজন মুণ্ডা খৃষ্টান কুলি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে এই ছেদিরাম একটি অদ্ভুত জীব। খৃষ্টান মিশনারীর স্কুলে অল্প কিছুদিন পড়ে সে খৃষ্টান হয়েছে বটে, কিন্তু আচার ব্যবহারে সে সম্পূর্ণ মুণ্ডা। এমন কি বনের ভূত দেবতার কাছে মুরগী বলি দেওয়া পর্য্যন্ত সে বজায় রেখেচে।

আমার গলা শুনে চক্কত্তি মশায় লণ্ঠন হাতে কুঁড়েঘর (তাঁবু নামে

অভিহিত) থেকে বার হয়ে এলেন। খালি গা, খালি পা, দেখে মনে হয় একদিনে যেন তাঁর বয়েস দশ বছর বেড়ে গিয়েচে, তাঁর গা হাত এমন কাঁপচে যে লণ্ঠনটা যেন ঠিকমত ধরে রাখতে পারচেন না।

আমি বল্লাম—কি ব্যাপার চক্কত্তি মশায় ?

—ওঃ বাঁচলাম ননীবাবু, এসেছেন আপনি! ছেলেটার বেলা তিনটে থেকে হঠাৎ হাই ফিভার—ভুল বকচে। একটা লোক নেই যার সঙ্গে অসুখের কথা বলি। বাঁচলাম এবার—আসুন—এমন সুরে তিনি কথা বল্লেন যেন আমি রেলের চিফ্ মেডিকেল অফিসার কিংবা জেলার সিভিল সার্জ্জন যেন স্বয়ং এসে গিয়েচি।

ঘরের ভেতরে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো, তাতে মন খুসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো না। সেই ছোট্ট খোপের একপাশে স্যাঁৎসেতে বর্ষাদিনের মেজেতে মলিন বিছানায় চক্কত্তি মশায়ের ছেলে সিধু শুয়ে আছে, বিছানার পাশে একটা কলাই করা গেলাসে আধ গেলাস জল। বোধ হয় রোগী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জল পান করে থাকবে। ঘরের লতাপাতার ঝাঁপের বেড়ার গায়ে বমির দাগ, রোগী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তার মুখ দেখা যাচ্চে না। চাল ফুটো হয়ে দু'জায়গায় জল পড়ে বলে এক জায়গায় একটা পাথরের বড় খোরা অন্য জায়গায় একটা কাঁসার বাটি পাতা।

আমি বল্লাম—কি হয়েচে ঠিক বলুন তো ? জ্বর এল কখন ?

চক্কত্তি মশায় বল্লেন—ঠিক বেলা সাড়ে তিনটার সময়। সেই থেকেই অজ্ঞান, ছেলের আর হুঁস চৈতন্য নেই—ভুল বকছিল এতক্ষণ, এই খানিকটা আগে একটু আবিল্লি মত এসেচে। ওর রকম সকম দেখে বড্ড ভয় হয়েছে ননীবাবু, আর এই ধরুন একা, এই রাত্তির কাল।

য় লোক নেই যার সঙ্গে—

—কুলীরা ক'জন থাকে ?

—মনসুখ আর ছেদিরাম ছাড়া রাত্রে সব যায় মদ খেতে জামদা'তে। সকালে আবার আসে—এক ব্যাটাও এখানে থাকে না। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে কি কথা বলি বলুন তো ? ওরা কি মনিষ্যি ?

ছেলেটিকে দেখলাম, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্চে, সত্যিই রোগীর হুঁস্ নেই, একটা থার্ম্মোমিটার নেই যে জ্বর দেখি—তবুও মনে হোল ১০৪° এর কম নয়।

ডাক দিলাম—ও সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ?

সাড়াশব্দ নেই। রোগী নিঝুম।

চক্কত্তি মশায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লেন—ননীবাবু কি হবে ? আমার ওই সবে ধন নীলমণি—ওকে বাঁচান আপনি—ননীবাবু পায়ে পড়ি আপনার—

ভদ্রলোক উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েচেন বুঝতে পারলাম—নইলে পিতার বয়সী বৃদ্ধ পায়ে ধরার কথা মুখে আনবেন কেন—

মৃদু ধমক দিয়ে বল্লাম—আঃ কি সব যা তা কথা বলেন ? অত ব্যস্ত হোলে চলে—ছিঃ—মুখে কথা বলে সাহস দিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে তখন আমি আকাশ পাতাল হাতড়ে ঠিক করতে পারচি নে যে এ অবস্থায় কি করি বা করা উচিত।

যিনি এমন অবস্থায় কখনো পড়েন নি, যেমন ধরুন যাঁরা স্বগ্রামের পৈতৃক ভিটেতে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর লাখরাজের উপস্বত্বে জীবিকা নির্ব্বাহ করে বাল্যাবস্থা থেকে বৃদ্ধত্বে পদার্পণ করেচেন কিংবা যাঁরা নিখুঁৎভাবে দশটা পাঁচটা আপিস করে সাহেবের মন জুগিয়ে পাঁচ বছর অন্তর দুটাকা মাহিনা বৃদ্ধি ভোগ করে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে ডিপার্টমেণ্টের বড় বাবুত্ব

লাভের কাছাকাছি এসে পৌছেচেন—তাঁদের পক্ষে এ সব অবস্থার কল্পনা করা সুকঠিন। মনে করুন চারিধারে উত্তুঙ্গ শৈলমালা, ঘন অরণ্যানী, বন্যঝর্ণা, যেদিকে চাওয়া যায় বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি জাতীয় বৃক্ষ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না, সম্পূর্ণ নির্জ্জন স্থান, বনের মাথায় সামান্য একটু নীলাকাশ মাত্র দেখা যায়, বনের দশহাত ভিতরে দিবালোকেও একা ঢুকবার সাহস যেখানে দুঃসাহস বলে গণ্য—এমন বেয়াড়া রয়েল বেঙ্গল জাতীয় মানুষ খেকো বাঘের উপদ্রব—সেখানে দিনরাত্রির ছেদহীন অবিরাম বর্ষার মধ্যে চালফুটো পাতার কুঁড়েঘরে একটি জ্বরে বেহুঁস রোগী, তার বৃদ্ধা অসহায় পিতা—আর কয়েকটি মুণ্ডা জাতীয় কুলী। রাত দুপুর ঘুরে গিয়েচে—একটা বাজে।

বিপদে পড়ে গেলাম।

না ডাক্তার, না ওষুধ, না পথ্যি, না একটা থার্ম্মোমিটার।

চক্কত্তি মশায় আকুলভাবে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বল্লেন—ছেলেটাকে বাঁচান।

তাতো বুঝতে পারচি। কিন্তু কি প্রকারে।

রাত সাড়ে বারোটা। ছেলেটা একভাবেই পড়ে আছে, মাঝে মাঝে জল খেতে চাইচে, দেখে মনে হোল, ঠিক ঘুম নয় এক প্রকারের অঘোর আচ্ছন্নভাবে পড়ে আছে—যাকে কোমা অবস্থা বলে।

আমি কুলীর সাহায্যে জল ফুটিয়ে নিলাম, সেই জল একটু ঠাণ্ডা করে রোগীকে দিতে গিয়ে মনে হোল তবুও যা হয় রোগীর প্রতি কর্ত্তব্য এই ভাবেই পালন করচি।

মনসুখ পাশের খোপে বসে তার সঙ্গী ছেদিরাম খৃষ্টানের সঙ্গে বক্‌বক্ করে ওদের মুণ্ডা ভাষায় কি গান করচে। আমি তাদের খোপে ঢুকলাম।

আমায় দেখে মনসুখের বকুনি থামলো, মুখে লম্বা কাঁচা শালপাতার পিকা অর্থাৎ বিড়ি ছিল সেটা ফেলে দিলে।

মনসুখ ওদের মধ্যে একটু বুদ্ধিমান, পরামর্শ করতে হোলে ওই একমাত্র বুদ্ধিমান লোক কুলীদের মধ্যে।

বল্লাম—কি রে মনসুখ, কি করা যায় বলতো ?

—বাবুজি, কি বলবো, ডাগ্‌দার ভি নেই, হাকিম ভি নেই, পানি বড় খারাপ আছে জায়গায়।

—কি করে জানলি।

—উ পানি আমরা পি না। একদম খারাপ পানি। বদ্‌ বু—

শুধু একটু জল ফুটিয়েই প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য সমাপ্ত করি।

রাত একটার সময় রোগী একবার বমি করলে—শুধু রক্ত। চক্কত্তি মহাশয়কে আমি সেটা দেখতে দিলাম না।

তখন বৃষ্টি সামান্য একটু থেমেচে—বাইরে এসে একবার দাঁড়ালাম। ঠিক যেন আফ্রিকার কোনো জনহীন পর্ব্বতারণ্যে আছি একা—উঁচু পাহাড় শ্রেণী চারিধারে বেড়াজালের মত ঘিরে রয়েচে, বৃষ্টিতুষ্ট অসংখ্য ঝর্ণাধারা কলরোলে ছুটচে সারেণ্ডা টানেলের উভয় পাশ ভাসিয়ে—দুটো কুলী ধাওড়া জলে ডুবুডুবু, ঝপাং ঝপাং শব্দে দুবার ধ্বস্‌ নেমেচে টানেলের এ মুখে। এদিকের কাজ চক্কত্তি মশায়ের হেপাজতে, কিন্তু তাঁর দ্বারা এমন কোনো বৈষয়িক কাজ হবার উপায় নেই—সুতরাং আমি মনসুখকে আলো নিয়ে ব্যাপার দেখে আসতে বল্লাম।

সে এসে বল্লে—বাবুজি, তুমি চলো। বহুৎ লুক্‌সান হোবে, শাল কুঁদা ঘুসাতে হোবে নেই তো ত্রিশ কুবিক্‌ ফুট ওয়ালা বড়া ধ্বস্‌ গিরবে।

ষাট সত্তর কি একশো রূপেয়ার বরবাদ।

কিন্তু শালের লগ লাগাবে কে ধ্বসের মুখে?· কুলী কই?

নিজে গিয়ে দেখে এলাম। মনসুখ কুলীর আশঙ্কা অমূলক নয়, প্রায় চল্লিশ কিউবিক ফুট দরের একটা চাঙ ছাড়বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েচে—কিন্তু সে অন্ততঃ দশজন কুলীর কাজ তাকে সামলে রাখা। আরও দেড় ঘণ্টা কেটে গেল!

চক্কত্তি মশায়কে কথাটা জানালাম। কারণ দায়িত্ব এবং লোকসান তাঁরই, একবার জানিয়ে রাখা দরকার।

বৃদ্ধ হতাশভাবে বল্লেন—তাইতো কি করি। আমি তো ছেলেকে ফেলে নড়তে পারচি নে এখন ননীবাবু—

—সেজন্যে কিছু ভাবনা নেই। আমি নিজেই সব করে দিতাম—কিন্তু লোক কই এত রাত্রে?

—এখানে যা আছে—

—ওদের ক'টীর কর্ম্ম নয়, অন্ততঃ পনেরো জনের কমে খুঁটি দেওয়া যাবে না।

—কি করব বলুন ননীবাবু। এমন হবে তা তো জানিনে, কুলীরা রাত্রে সব চলে যায় ছুটি নিয়ে। তাদের বস্তি সেই নেড়া মস্‌রা আর একটা বস্তি ভালুককোটা—

মনসুখকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল উভয় বস্তিই এখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চার পাঁচ মাইল দূরে। এই রাত্রে কেউ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেখানে যেতে রাজি হবে না!

চক্কত্তি মশায় হতাশ ভাবে বল্লেন—তাই তো ধনে প্রাণে মারা গেলাম ননীবাবু—

বৃদ্ধের অবস্থা দেখে সত্যি বড় দুঃখ হোল। বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন করতে এসে ভদ্রলোক এমন বিপদের জালে আটকে গেল—এ থেকে অনেক ভাগ্য না থাকলে উদ্ধার পাওয়া দায়। কারণ সারারাত্রি যদি এমন ধ্বস নামে তবে বৃদ্ধকে সারেণ্ডা টানেলের কণ্ট্রাক্টারি করে লাভের পয়সা বাড়ী নিয়ে যেতে হবে না।

ছেদিরাম খৃষ্টানকে ডাকিয়ে তাকে বল্লাম—লোক পিছু দু দু'টাকা বখ্‌শিস, যোগাড় করবে আনতে পারলে। আমি নিজের পকেট থেকে দেবো—ব্যবস্থা করতেই হবে।

ছেদিরাম খৃষ্টান বল্লে—আমি নিজে যাচ্ছি বাবুজি কিন্তু দু'জন লোক সঙ্গে দিন।

এমন সময় চক্কত্তি মশায় ব্যস্তভাবে আমায় ডাক দিলেন—একবার শীগ্‌গির আসুন ননীবাবু—

কুঁড়ের মধ্যে গিয়ে দেখি রোগী আর একবার রক্তবমি করেচে, বিছানার খানিকটা অংশ টাটকা রক্তে ভেসে গিয়েচে! আমার দিকে চেয়ে চক্কত্তি মশায় তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম—এত উতলা হলে চলে না চক্কত্তি মশায়—রোগীর সামনে কাঁদতে নেই—ওকি?

ছেদিরাম খৃষ্টান আমায় বাইরে ডেকে বল্লে—কি হুকুম বাবুজি? যাতে হোবে ভালুককোটা?

—শোনো ছেদিরাম, চক্কত্তি বাবুর ছেলের শক্ত বেমার। যে কোনো রকমে হোক, কাল সকালে ডাক্তার আনতে হবে! কন্‌ষ্ট্রাক্‌সনের ডাক্তার রয়েচে সেই চক্রধরপুর, ট্রলি করে নিয়ে আসতো তো বেলা তিনটে বাজবে। আর কোথাও ডাক্তার নেই কাছাকাছি?

ছেদিরাম হেসে বল্লে—নেই বাবুজি। বংগা ডর খেয়ে পালিয়ে যায়, এমন ওস্তাদ আছে। ডাগদার নেই!

রোগীর গায়ে হাত দিয়ে মনে হোল জ্বর নরম পড়ে আসচে। আগের চেয়ে গায়ের তাপ কম। কোন রকমে এ ভীষণ দুর্য্যোগের রাত্রি প্রভাত হোলে যে বাঁচি। রাতেরও কি পোহাবার নামটি নেই, উত্তুঙ্গ শৈলশীর্ষে অন্ধকার তেমনি নিরন্ধ্র, জনহীন বনভূমি তেমনি ভয়ঙ্কর।

কুঁড়ের মধ্যে রোগীর শিয়রে চক্কত্তি মশায় বসে, তাঁর চোখে শূন্য দৃষ্টি। তাঁর দিকে চেয়ে আমার মনে কষ্ট হোল। আমার মনে এমন এক গভীর অনুভূতি জাগ্রত হোল যা জীবনে কখনো অনুভব করিনি। মনে হোল এ অসহায় বৃদ্ধের জন্য আমি সব কিছু করতে পারি, নিজের সব টাকা খরচ করে ওর কাজ তুলে দিতে পারি, যেখান থেকে হোক, যত পয়সা খরচ করে হোক, ডাক্তার এনে ওর ছেলেকে সারিয়ে তুলতে পারি—এতে আমাকে সর্ব্বসান্ত হতে হয় তাও স্বীকার।

মনসুখকে বল্লাম তাদের এখুনি ট্রলি করে রওনা হতে হবে চক্রধরপুর। ডাক্তার যে করে হোক আনতে হবেই। আমি চিফ ইঞ্জিনিয়ার আপিসের কেরাণীর নামে একটা চিঠি লিখে দিলাম, যাতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন ডাক্তার পাঠাবার জন্যে। মনসুখ রওনা হয়ে চলে গেল ট্রলিতে।

ট্রলি ঠেলবার জন্যে চারজন কুলী দিতে হোল সুতরাং এখানে রহিলাম আমি, চক্কত্তি মশায়, রোগী আর ছেদিরাম। এ অবস্থায় ছেদিরামকে ভালুককোটায় কুলী যোগাড় করতে পাঠাতে পারলাম না, এক ছেদিরাম ভরসা এই বনের মধ্যে, তাকে পাঠালে চলে না। ছেদিরামের সবল দীর্ঘ দেহ, শক্ত হাত পা আমার মনের মধ্যে এই বিপদের সময় সাহস ও শক্তি

যোগাচ্ছিল। ঠিক বলতে গেলে রোগী নিয়ে আমি একা পড়ে যাব যদি ছেদিরাম এখন চলে যায়, কারণ বৃদ্ধ চক্কত্তি মশায় এখন হিসেবের বাইরে।

বৃদ্ধ আমায় ডেকে বল্লেন—নাড়ী দেখতে জানেন ননীবাবু। দেখুন তো একবার। ও যেন ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়চে—

নাড়ীজ্ঞান বিষয়ে আমি সাক্ষাৎ ভূদেব কবিরাজ, তবুও দিশাহারা বৃদ্ধের মন শান্ত করবার জন্যে রোগীর হাত দেখে বল্লাম—না, কিছু নয়, বেশ নাড়ী। ভয় খাবেন না—ডাক্তার আনতে গিয়েচে, আমি চিঠি লিখে দিলাম ঘোষ বাবুকে, ঠিক পাঠাবে।

চক্কত্তি মশায় বল্লেন—কত বেলায় ডাক্তার পৌঁছবে আপনার মনে হয়?

—এই একটু বেলা—এই ধরুন গিয়ে বেলা ন'টা দশটা—

—এত শীগগির আসতে পারবে চক্রধরপুর থেকে?

—নিশ্চয়ই, তাড়াতাড়ি এসে পড়বে দেখবেন।

যদিও মনে মনে বেশ জানি, খুব তাড়াতাড়ি করে এলেও বেলা তিনটের কম এখানে ডাক্তারের পৌঁছানো অসম্ভব, তবুও একথা না বলে উপায় কি? রোগীর অপেক্ষা বৃদ্ধের ওপর আমার সহানুভূতি এখন বেশী।

বৃদ্ধ বল্লেন—জ্বর কমে আসছে কিন্তু দেখুন গাটা—

রোগীর গায়ে হাত দিয়ে আমারও তাই মনে হোল। ঘাম হচ্ছে একটু একটু, আগের চেয়ে গা অনেক ঠাণ্ডা। জ্বর কি ছাড়চে? কি জানি, কি করে বলবো—ডাক্তারির কিছুই যখন জানি না।

বল্লাম—একটা থার্মোমিটার পর্য্যন্ত সঙ্গে না আনা—খুব ভুল হয়ে গেছে।

চক্কত্তি মশায় বল্লেন—ভালোয় ভালোয় এবার সেরে গেলে নাটাবেড়ের মা কালীর পূজো দেবো—মা ভাল করে দিন এবার—

এবার আর কোনো ভুল করচি নে। হোমিওপ্যাথিক বাক্স পর্য্যন্ত আনবো সঙ্গে। জ্বরটা ছেড়ে যাচ্চে—কি বলেন?

—তাই বলেই মনে হয়—

চক্কত্তি মশায়ের সামনে ধূমপান করতাম না—বাইরে বেরিয়ে একটা বিড়ি সবে ধরিয়েছি, এমন সময় চক্কত্তি মশায় আবার ব্যস্তভাবে আমায় ডাক দিলেন—ননীবাবু, ননীবাবু—আসুন শীগগির—

তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি রোগী আবার রক্তবমি করেচে—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখচোখের ভাব যেন কেমন বদলে গিয়েছে।

চক্কত্তি মশায় আকুল স্বরে বল্লেন—অমন করচে কেন? ওকি হোল ননীবাবু?

রোগী আর নড়চে চড়চে না—হাত পা ঠাণ্ডা। গায়ের ঘামে বিছানা ভেসে গিয়েচে। চোখের তারা যেন ধীরে ধীরে কুঁড়ের চালের দিকে কি খুঁজতে লাগলো।

ডাক্তার না হোলেও বুঝলাম ব্যাপারটা।

ছেদিরাম পাশের খোপে ছিল। তাকে বাইরে ডেকে বল্লাম—ছেদিরাম, চক্কত্তি বাবুর ছেলে মারা গেল।

ছেদিরাম খৃষ্টান অত বড় জোয়ান মানুষ, আমার কথা শুনে তার ভয় হোল দেখলাম। বল্লে,

—একদম বাবুজি!

—একদম।

—উঃ, চক্কত্তি বাবুর বড় খারাব হোল। সদাপ্রভু যীশু—

বিপদের সময় হঠাৎ তার খৃষ্টানধর্ম্মের ভাব উথলে উঠলো। আমি ধমক দিয়ে বল্লাম—রাখ তোর সদাপ্রভু ট্রভু—এখন কি করা যায় বল্ না? এখানে শ্মশান কোথায়?

—কারো নদীর ধারে বাবুজি—পাঁচ ছ' মিল্ রাস্তা আছে।

—ভোর হলেই ভালুককোটা যাবি লোক ডাকতে।

এই সময় আবার ভয়ানক বর্ষা নামলো। ছেদিরাম তার নিজের খোপে গেল। আমি ঢুকলাম রোগীর খোপে। চক্কত্তি মশায় ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি তখনও. আমায় বল্লেন—খোকার বোধ হয় ফিট্ হয়েচে, মাথায় খুব জল দিচ্চি—দেখুন তো?

চেপে রেখে লাভ নেই—আর কতক্ষণই বা চেপে রাখবো। বল্লাম চক্কত্তি মশায়কে।

চক্কত্তি মশায় মেয়ে মানুষের মত হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। আর তার কিছুক্ষণ পরেই ভীষণ বর্ষার বারি পতনের মধ্যে সারেণ্ডা টানেলের মুখে এক গম্ভীর শব্দ হোল—যেন সমস্ত সারেণ্ডা পাহাড়টা ভেঙে পড়লো। ছেদিরাম তড়াক করে লাফিয়ে এসে বল্লে—বড় ধ্বস্ গিয়েছে বাবুজি—

চক্কত্তি মশায় লোকটা সত্যই ধনে প্রাণে মারা গেল।

ছেদিরাম দুঃখিত স্বরে বল্লে—যীশু সদাপ্রভু আমাদের—

—আবার! থাম্—

পূবদিকের পাহাড়ের মাথায় অন্ধকার যেন একটু স্বচ্ছ দেখাচ্চে। কালরাত্রি এইবার বোধ হয় প্রভাত হবার উপক্রম করচে! দিনের আলো দেখতে পেলেও যে বেঁচে যাই।

ক্রমে ফর্সা হয়ে গেল। বৃষ্টি তবুও থামে না—মনে হোল যেন আকাশ পৃথিবীর বুকে ভেঙে পড়বে। মৃতদেহের চারিদিকে আমরা তিনজনে বসে রইলাম। বেলা ন'টার পর কুলীরা একে একে এল।

তারা ব্যাপার শুনে সবাই দুঃখিত হোল এবং তাদের নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করতে লাগলো।

ছেদিরাম এসে জানালে টানেলের মুখে বিরাট ধ্বস্ নেমেছে, কুলীদের দাঁড়াবার জন্যে যে দুটো খোড়ল করা গিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে তা একদম ধুয়ে মুছে গিয়েছে। চক্কত্তি মশায় তিন চারশো টাকার ধাক্কায় পড়ে গেলেন। আমার দুর্ভাবনা হোল, আমার দিকে কি অবস্থা ঘটলো।

সবাই মিলে বেলা বারোটার পর বৃষ্টি থামলে মৃতদেহ বহন করে তাঁবু থেকে পাঁচ মাইল দূরে কারো নদীর ধারে নিয়ে গেলাম। চক্কত্তি মশায়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে এখনও ধ্বস্ নামার কথা কিছু বলা হয়নি, বৃদ্ধ সত্যই ধনে প্রাণে মারা যাওয়ার সামিল হয়েচেন।

পার্ব্বত্য কারো নদীর শিলাস্তৃত তীরভূমিতে মৃতদেহের সৎকার করা গেল। নামেই সৎকার, কোথায় শুকনো কাঠ পাবো এই ঘোর বর্ষার দিনে। বৃষ্টি মাথায়? বর্ষার জলে কারো নদী ফুলে ফেনিয়ে গর্জ্জে দু দিকের পাষাণময় কূলের গণ্ডী ডিঙিয়ে ভেঙ্গে, লাফাতে লাফাতে ছুটেচে। প্রকাণ্ড পাথর বেঁধে কোনো জিনিস ভাসিয়ে দিলে তার ঠিকানা পায় কেউ? মানুষের দেহের তো কথাই নেই।

নির্ব্বান্ধব প্রবাসে পিতৃহৃদয়ের গভীর শোক হোল তাঁর পর জগতের পাথেয় এবং হতভাগ্য পিতার শুষ্ক চোখের শূন্য দৃষ্টি। সারেণ্ডা টানেল

প্রথম বলি গ্রহণ করলে। আমার কানে কেবল যেন সারারাত ব্যাপী বৃষ্টির শব্দ, আর ছেদিরাম খৃষ্টানের বক্‌বক্ বকুনি, আর টানেলের মুখে গুম্ গুম্ ধ্বস্ নামার গম্ভীর আওয়াজ—গোলমালে মাথাটা কেমন হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধের লাভের আশা, কণ্টাক্টারি করা, ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা, কারো নদীর বুকে ফেনার ফুলের মত চঞ্চল, নশ্বর, নিতান্তই

এসব দার্শনিক চিন্তায় বাধা পড়লো—ছেদিরাম বল্লে—চলিয়ে বাবুজি সদাপ্রভু যীশু—

ধমক দিয়ে বল্লাম—চুপ্—রাখ্ ওসব। চক্কত্তি বাবুর হাত ধরে নেও—আগে আগে চল্।

আমরা সন্ধ্যার সময় ফিরে দেখি মনসুখ ডাক্তার নিয়ে এসেচে। ডাক্তার সব শুনে বল্লেন—

ব্লাকওয়াটার ফিভার।

কম্‌বাইণ্ড্‌ হ্যাণ্ড্‌

রাধারাণী দেবী

পুরানো মনিবের বাড়ী। বাড়ীর প্রত্যেকটি জায়গা, দালান, বারান্দা, ঘর,—সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, বাঁক, চাতাল গুণনিধির মুখস্থ। দোতলার এই বড় ঘরখানি ড্রয়িংরুম। তার সামনে শ্বেত পাথরের ছোট্ট দালানের উত্তর কোণটায় খাওয়ার টেবিল। তেতালার উপরে বেড্‌রুম। তারই পাশে যত বই, খাতাপত্র আর আলমারী, ড্রেসিংমিরর, টেব্‌ল্‌ফ্যান প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বোঝাই করা চক্‌চকে হলদে মোজায়েকের মেঝের একটা মাঝারি ঘর। গুণনিধি জানে ঐ ঘরটির দালানের দিকের দরজা বাইরে থেকে টানলে ফাঁক হয়। খন্তি বা চামচ বাইরে থেকে সাবধানে ঢুকিয়ে, খিল নামানো যায়।

এমন অনেক দিনই হয়েছে, বাবু হয়তো শোবার ঘরের দরজার চাবি ঘরের ভিতরে রেখে, ভুলে বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়েছেন। ইয়েল্‌ লক্‌, দরজার গায়েই লাগানো। ঘরের ভিতর থেকে হাতল ঘুরিয়ে খোলা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে চাবি না হলে খোলা যায় না। বিলাতী কায়দার যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড। কতবারই চাবি ভিতরে থেকে গেছে, দরজা টেনে বন্ধ করা হয়েছে। তখন গুণিয়াই নানা ফন্দী উদ্ভাবন করে, পাশের ঘরের দরজা টেনে অল্প ফাঁক করে, বড় ছুরী বা বড়

চামচের হাতল দরজার মধ্যে ভরে দিয়ে, আস্তে আস্তে চাড় দিয়ে খিল নামিয়েছে। তারপর পাশের ঘরের ভিতর দিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে, হাতল ঘুরিয়ে ইয়েল্ লক্ খুলেছে দরজার।—

কতো প্রশংসা করেছেন তখন, বাবু আর মা তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির। কোনোদিন কেউই কি ভেবেছিল, সেই গুণনিধিই আসবে তার পুরানো মনিবের বাড়ী এমন গভীর রাত্রে। ঘুমন্ত মনিবের বন্ধ শোবার ঘরের দরজা এই রকম নিঃশব্দে চুপিচুপি খুলবার জন্য? কিন্তু কি করবে সে? উপায় যে আর অন্য কিছুই নেই। একমাসের উপর হোলো সে মাত্র একবেলা খেতে পেয়েছে, তাও অর্দ্ধেক দিন আধপেটা। তিন চার দিন হোলো একরকম প্রায় অনাহারেই আছে সে। তার উপরে দেশ থেকে চিঠি এসেছে ছোট্ট চার বছরের মেয়েটি তার মর-মর। বৌটারও নাকি ভীষণ অসুখ। মা খবর দিয়েছেন চিঠিতে—"যেমন করেই হোক কয়েকটা টাকা নিশ্চয়ই শীঘ্র পাঠাবে। নইলে তোমার স্ত্রী ও মেয়ে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে মৃত্যুমুখে পড়বে জেনো।"

এই চিঠি পাওয়ার পর থেকে গুণিয়ার মাথা গেছে ঘুলিয়ে। সমস্ত মন উঠেছে ক্ষেপে। তার আগেকার যত কিছু বুদ্ধি বিবেচনা নীতিজ্ঞান সমস্তই অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হয়ে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব উপস্থিত করেছে মনের মধ্যে। কে বলে চুরি করা পাপ? পাপ যে, তার ঠিক কি? স্বামী হয়ে নিজের স্ত্রীকে, বাপ হয়ে আপন সন্তানকে অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে—নিজের চরিত্র ও ধর্ম্ম বজায় রাখলে কী পুণ্য তার হবে? বরং পরকালে নরক বাসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে—সেই অসহায় পীড়িতদের এক ফোঁটা ওষুধ কিংবা শুখনো জিভে এক ঝিনুক বার্লি দুধ দেওয়া কি তার বেশী কর্ত্তব্য নয়? তাদের ক্ষুধায়

আহার, রোগে পথ্য জোগাবার দায়িত্ব তার বেশী ধর্ম্ম, না পরকাল পর-জন্মের ভয় তার বেশী ধর্ম্ম ?

না—এতকাল সে তো কখনও কোনও অন্যায় কাজ করেনি। কোনও অধর্ম্ম করেনি। চুরি করা দূরে থাকুক, সে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে লোককে সাহায্য বা উপকার করা ছাড়া জ্ঞানতঃ কখনও কারো অনিষ্ট করেনি। কিন্তু তাতে হোলো কী ? কিছুই নয়। শুধু দুর্দ্দশা!

যতোদিন তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, সে চাকরী করতো। মনিবের বাড়ী সে ছিল কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড। কেবলমাত্র রান্নার কাজের জন্যই সে নিযুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু নিজের সর্ব্বকর্ম্ম-পারদর্শিতায় আপনা হতেই হয়ে উঠেছিল কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড। মনিবের সংসারে যদিও অন্য আর একজন চাকর ও একটি ঠিকা চাকরাণী ছিল কিন্তু তাদেরও সমস্ত কাজ বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল গুণনিধিরই। সমস্ত সংসারটা ছিল তারই মুঠার মধ্যে। সে একাই রাঁধুনীবামুন, বাবুর্চ্চি, চাকর, খানসামা, পিওন, বাজার সরকার এমন কি শিশু মানুষ করা নার্সের কাজও—যখন যেটা দরকার পড়েছে, স্বেচ্ছায় সুচারু সম্পন্ন করেছে।—

সংসার উদাসীন আত্মভোলা মনিব ও চিররুগ্না মনিবপত্নী ছিলেন যেন গুণনিধিরই সংসারে মাননীয় অতিথি মাত্র। সে তাঁদের ইচ্ছা ও রুচিমত আহার, বিহার, বিশ্রাম ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের সুশৃঙ্খল সুব্যবস্থা করে দিয়েছে অন্য দুটি সহকারীর সাহায্যে। মনিবও তাকে ভালবাসতেন যথেষ্ট, বিশ্বাস করতেন অপরিসীম।

এই গুণনিধি গত বছর পড়লো নিউমোনিয়া রোগে। অসুখে মনিব খুবই তদারক করেছিলেন। অনেক টাকা খরচ করে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তাকে। অসুখ সারলো বটে, কিন্তু গুণনিধির স্বাস্থ্য পড়লো

একেবারে ভেঙ্গে। অসুখের পর দেশে গিয়ে বিশ্রাম নিলো প্রায় এক বৎসর। এই এক বৎসর বিনা রোজগারে দেশের সংসার আর নিজের পেট চালাতে, সামান্য জমিজঁমা যা' ছিল, তা' গেল। কলকাতায় ফিরে এসে কাজ মিলল না কোথাও।—

ভাঙা শরীর দেখে পুরানো মনিব রাখতে ভরসা পেলেন না। বললেন—শুনেছিস্ তো, তোর মা আর নেই। বেহারী কাজ করছে এতদিন। মহাদেব রান্না করছে তোর সেই অসুখের সময় থেকে। ওদের জবাব দিই কেমন করে? খুকুর জন্যেও আর একটা লোক রাখতে হয়েছে। আমি বরং তোকে ভাল করে একটা সার্টিফিকেট্ লিখে দিচ্ছি, তুই কোথাও একটা কাজকর্ম্ম খুঁজে নে।' পুরানো মনিব নরেশবাবু লিখে দিলেন,—"গুণনিধি মাইতি। আমার বাড়ী চৌদ্দ বৎসর অতি বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করেছে। অত্যন্ত বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সৎব্যক্তি ইত্যাদি।"

চিররুগ্না গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুতে সংসারের নিয়ম রীতি অনেক বদলে গেছে লক্ষ্য করলো গুণনিধি। মনিবের সংসারের এই পরিবর্ত্তনে তার মনে আঘাত লাগলো মর্ম্মান্তিক। এ যেন তার নিজেরই হাতে গড়া জিনিষের রূপান্তর দেখছে সে। যেটা সহ্য করতে কষ্ট বোধ হয়।

মনিব তার গৃহ-উদাসীন মানুষ। সংসারে বাস করেন বটে, সংসারের ভাল মন্দর খোঁজ রাখেন না। রাখবার মতো মানসিক গঠন তাঁর নয়। নিজের কর্ম্মস্থল অফিসে নিয়মিত সময়ে যাওয়া আসা ছাড়া, বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন, লাইব্রেরীতে বসে পড়া এবং লেখা এই তাঁর একমাত্র কাজ ও আনন্দ। সাহিত্য চর্চ্চা ছাড়া তাঁর জীবনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা আনন্দ নেই।

গুণনিধি এই সদাতুষ্ট শান্ত প্রকৃতির মানুষটিকে ভক্তি ও সম্মান করে যতখানি, ততখানিই তাঁর জন্য মমতা বা অনুকম্পা বোধ করে।

গৃহিনী যতদিন জীবিত ছিলেন, রোগের দরুণ কর্ম্মঅপটু হলেও, সংসারের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য সাধনের প্রতি এবং স্বামী ও শিশুকন্যার যত্নের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল। সেজন্য সংসার তখনও লোকজনের দ্বারা চালিত হলেও, এমন শ্রীহীন বা বিশৃঙ্খল ছিল না।

এখন একটা বুড়ী মাদ্রাজীআয়া খুকুর ভার নিয়েছে। ছয় বছরের খুকু তাকে মোটেই পছন্দ করে না। তার সঙ্গে এখনও পর্য্যন্ত খুকুর বনিবনা হয়নি। রেগে গেলেই তাকে সে "রাক্ষুসী বুড়ী" বলে। সমস্ত সংসারটার চেহারা কেমন যেন আড়ষ্ট বিশ্রী হয়ে গেছে। সব চেয়ে কষ্ট হয় গুণনিধির খুকুটার জন্য। ছোট্টো বয়স থেকে গুণিয়াই একরকম তাকে মানুষ করেছে। মার কতো যত্নের কতো আদরের খুকু! আহা! তার যত্ন, তার স্বাস্থ্যে কী সয় না সয়, কী করে জানবে ঐ নতুন আয়াবুড়ী! বাবু তো সংসারের কিছুই বোঝেন না! রান্নাঘর, ভাঁড়ার-ঘর, সংসার—প্রভৃতি ব্যাপারগুলিতে বাবুর যে দারুণ আতঙ্ক, তা' গুণিয়া খুবই জানে।

সার্টিফিকেট নিয়ে আজ দেড় মাস ধরে ঘুরেছে নানা জায়গায় সে। এই এক মাস পুরানো মনিব নরেশবাবুর বাড়ীতে এসেই দু'বেলা দু'মুঠা করে খেয়ে গেছে। কিন্তু এমন করে বসে ভাত খেয়ে এখনকার বাজারে আর কতদিন চলবে? সেদিন মনিবের রাঁধুনী মহাদেব তাকে বলেছে, কাজ খুঁজে না পাস্ তো দেশে চলে যা' না! এমন করে বারোমাসই কি বাবুর ঘাড়ে খাবি নাকি? বাবু না হয় কিছু খোঁজ রাখেন না, বা বলেন না, কিন্তু আমাদের নিজেদের তো একটা বিবেচনা থাকার দরকার।

এর পর আর সে পুরানো মনিবের রান্নাঘরে মহাদেবের দ্বারস্থ হয়ে অন্নপ্রার্থী হতে পারেনি। হায় রে! আজ মহাদেব কিনা তাকে মনিবের প্রতি কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে উপদেশ দেয়! যে-সংসারে আজ বেহারী ও মহাদেব স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে, ঐ সংসার এতকাল কার 'নিজস্ব' ছিল? কার অধীনে আর ইচ্ছায় ঐ সংসারের প্রত্যেকটি ব্যবস্থা হয়েছে এতকাল? ঈশ্বর যদি তাকে এমন করে রোগে না ফেলতেন, তাহ'লে আজ এমন হবে কেন? 'মা'ও যদি বেঁচে থাকতেন', তা'হলে আজ গুণনিধির জায়গায় মহাদেব দেবাংশির সাধ্য ছিল না প্রভুত্ব করার। থুকু—কার হাতে মানুষ? সংসার কার হাতে সাজানো?

আজ ক'দিন ধ'রেই গুণনিধি ক্ষুধাতৃষ্ণা পেটে নিয়ে অনবরত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে।—কোনও উপায় খুঁজে পায়নি। আজ সে স্থিরসংকল্প—চুরি করবেই। চুরি সে জীবনে কখনও করেনি। চুরি করার মত সাহস ও পটুতা তার নেই। অন্য কোথাও চুরি করতে গেলে সে ধরা পড়বেই। একমাত্র চুরি করে ধরা পড়ার ভয় নেই তার মনিব বাড়ীতেই। যে মনিবের বাড়ী সে নিজের গৃহসংসারের চেয়েও আপন ভেবেছে এতকাল ধরে, যে বাড়ীকে সে ভালবেসেছে নিজের বাড়ীর চেয়েও বেশি। কিন্তু না—এত দুর্ব্বল হলে তার চলবে না। তার সন্তান তার স্ত্রী মৃত্যুর মুখোমুখী। এখন বিবেকের বক্তৃতায় সে কিছুতেই কাণ দেবে না। যতই কেননা তাকে তার মনিব এই দুঃসময়েও বিনা আপত্তিতে দেড় মাস অন্নদান করে থাকুন আর তাকে দারুণ নিউমোনিয়ায় মর-মর অবস্থায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে থাকুন,—তবু গুণিয়াকে তার সেই মনিবের বাড়ীতে চুরি করতেই হবে। হ্যাঁ, আজই রাত্রে। দেরী করলে চলবে না। আজ তাকে রীতিমত

চোরের মত বাগানের পাঁচিল টপ্‌কে বাড়ী ঢুকে—রান্নাঘর আর চাকরদের ঘরের দিকের পিছনকার লোহার ঘুরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে হবে। কোন্‌খান্‌ দিয়ে গিয়ে—কোথা থেকে কী নিতে হবে—সে তার চেয়ে ওবাড়ীতে অন্য কেউই ভাল জানে না।

সে জানে মনিবের সিন্দুকের চাবি কোথায় থাকে? নিঃশব্দে টেবিলের ড্রয়ার টেনে চাবির গোছা বের করে তার মধ্যে হাত বুলিয়ে একটা সরু লম্বা চাবি আন্দাজে ঠিক করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রেসিং টেবিলের চাবিবন্ধ ড্রয়ারে সিন্দুকের চাবি থাকে। নিঃশব্দেই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খোলা হল, ভিতরে হাত দিতেই চ্যেনে গাঁথা নিকেলের চকচকে মোটা বেঁটে চাবি হাতে ঠেক্‌ল। হ্যাঁ, এইটাই। অন্ধকারের মধ্যেই ধীরে ধীরে খাটের পাশে এগিয়ে গেল দক্ষিণের দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের গায়ে গাঁথা ছোট্ট লোহার সিন্দুক। গোল ডালাটি দেওয়ালের সঙ্গে সমান লেবেলে মিশে আছে সিন্দুকের অস্তিত্ব যাতে টের পাওয়া না যায়, সেজন্য দেওয়ালের গায়ে একখানি ছবি টাঙানো সেখানে। গুণনিধি হাত দিয়ে ছবিখানি স্পর্শ করে আস্তে আস্তে ছবিখানি তার পিতলের হ্যাঙ্গার থেকে খুলে ধীরে ধীরে মেঝেয় নামিয়ে রাখল। সে অন্ধকারের মধ্যেও মনশ্চক্ষুতে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল ফ্রেমে বাঁধানো কাচে ঢাকা ছবিখানির চেহারা। ক্রুসে বিদ্ধ যীশুখৃষ্ট উর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের কাছে অবোধ মানুষদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। তাঁর সমস্ত মুখে স্বর্গীয় আভা—মূর্ত্তি ঘিরে জ্যোতির্ম্ময় পরিমণ্ডল। এই ছবিখানি মৃতা মনিবপত্নী খুব ভালবাসতেন। তাঁর রোগযন্ত্রণা যখন অসহ্য হোত, তিনি এই ছবিখানি তাঁর সামনের দিকে দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়ার জন্য কতবার গুণনিধিকে হুকুম করেছেন।

নিবিড় গাঢ অন্ধকারে দেওয়ালের মসৃণ চূণকাম স্পর্শে আন্দাজ করে এগিয়ে কন্‌কনে ঠাণ্ডা লোহার সিন্দুকের গোল ডালাটি হাতে অনুভূত হল। নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেই চাবি লাগিয়ে ডালা খুলে ফেলতে তার একটুও অসুবিধে হল না। ভিতরে হাত পুরতেই হাতে ঠেকলো সোনার গহনা। মনিবপত্নীর গোছাভর্ত্তি সোনার চুড়ি, কঙ্কণ, হার। এগুলি কি? খুকুর ব্যাঙ্গেল, খুকুর বেবী চ্যেন্। সমস্ত নিজের ছেঁড়া ময়লা শার্টের পকেটে পুরে ফেললে গুণনিধি। আবার সিন্দুকে হাত পুরলে, একটা সূতা বাঁধা নোটের গোছা। হাত বুলিয়ে আন্দাজে বুঝতে পারলে, সবগুলিই দশ টাকার নোট। নোটগুলিও সিন্দুক থেকে বের করে নিলে। অন্ধকারেই সিন্দুকের চাবি বন্ধ হোলো হ্যাঙ্গারে ছবি টাঙানোও হয়ে গেল। এইবার পা টিপে টিপে এগুতে হবে। চাবিটা ঠিক জায়গায় রাখতে হবে।

পাশের ঘরে খুকু কেঁদে উঠলো—'গুণা—ভাইয়া—'

বুকের ভিতরটায় ঠিক যেন সজোরে মুগুরের ঘা পড়লো গুণিয়ার। খুকুর স্বরটা যেমনি করুণ তেমনিই যেন আর্ত্ত। গুণনিধি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। খুকু আবার কাত্‌রে উঠলো—মা,—জলখাব —ওমা—

গুণনিধি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। আহা রে! বাচ্চাটা এখনো তাকে ভোলেনি! ঘুমের মধ্যেও তার নাম করছে। কিন্তু অমন কাৎরাচ্ছে কেন? অসুখ করেনি তো? গুণনিধি গিয়ে ছোট্ট খাটের মাথার দিকে দাঁড়াল। খুকু একটা অস্পষ্ট কাতর আওয়াজ করছে। মশারীর মধ্যে হাত দিয়ে খুকুর কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করে গুণনিধি চমকে উঠলো। উঃ, কপাল যে জ্বরে পুড়ে যাচ্চে। খুকু কচি

হাত দিয়ে কপালে ঠেকানো হাতখানা ধরে বললো—জল দাও মা—তেষ্টা পেয়েছে—

গুণনিধির বুকের ভিতরটা বেদনায় মুচ্‌ড়ে উঠলো। মরে যাই রে! মা-হারা কচি বাচ্চা! জ্বরের ঘোরে তার ঠাণ্ডা হাতখানাকে মায়ের হাত মনে করেছে। তৎক্ষণাৎ সে দৃঢ় দ্রুতপায়ে এগিয়ে ঘরের অন্য পাশে গিয়ে স্থইচ বোর্ডে হাত দিয়ে আলো জ্বালল। প্রখর আলোয় ঘর ঝল্‌সে উঠলো। খুকুর ছোট্টো খাটের ওপাশে সবুজ রঙের মেঝেয় কম্বল বিছিয়ে মাদ্রাজী আয়াটা অবাধে ঘুমুচ্ছে। তার কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের চারিপাশে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রাক্ষুসীর মতই দেখাচ্ছে মনে হল গুনিয়ার। খুকুভাই ঠিক নামই দিয়েছে ওর। রাক্ষুসী বুড়ীই বটে। গুণনিধি চেয়ে দেখল পাশের ঘরে বাবুর খাট শূন্য। বিছানায় বাবু নেই। বুঝল, দোতলায় লাইব্রেরী ঘরেই বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে সেখানেই শুয়ে পড়েছেন চৌকীতে।

আগেও এমন ঘটতো। কতোবার রাত্রি দু'টো আড়াইটের সময় মা দোতলায় নেমে লাইব্রেরী ঘর থেকে বাবুকে উপরে তুলে এনেছেন লাইব্রেরীর আলো নিভিয়ে। এখন বাবু লাইব্রেরী ঘরে বিনা বালিসে বিনা মশারীতে তক্তাপোষের উপরে পড়ে থাকলে উপরে তুলে আনবার বা মশারী খাটিয়ে বালিস দিয়ে আসবার মত চাকর ঐ মেড়ো বেহারী বা ফাজিল মহাদেব কখনও নয়।

গুণনিধির সমস্ত রাগটা মহাদেব ও বেহারীর উপর। এই দুর্গতির মূল যেন তারাই। তার নিজেরই দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় আজ তার এই অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এটা যেন মানতে তার মন রাজী নয় যে মনিবপত্নীর মৃত্যু এদের দুঃখের কারণ। গুণনিধি খুকুকে

জল খাওয়ালো বড় চামচ খুঁজে এনে। খুকু চোখ মেলে গুণনিধির পানে তাকিয়ে চিনতে পারল। জ্বর আরক্ত মুখে বললো—গুণা-ভাইয়া,—বড় মাথা ব্যথা করছে—

গুণনিধি বললো, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি ভাই, তুমি ঘুমোও। গুণনিধি সুন্দর করে খুকুর নরম চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে রগ ও কপাল টিপে দিতে লাগলো। খুকু আরামে চোখ বুজে রইলো। একটু বাদে হঠাৎ খুকু চোখ মেলে আরক্ত চোখে চাইলো মাথার দিকে। গুনিয়া ঝুঁকে পড়ে বললো,—কী চাই দিদিভাই ?

—গুণাভাইয়া, তুমি চলে যেওনা আমাকে ফেলে।

—না ভাই যাব না আমি।

—ঠিক বলচো তো ?

—হ্যাঁ। তুমি চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চি।

খুকু রাত্রে একবার বমি করলো। গুণিয়া আশ্চর্য্য হয়ে গেল আয়াবুড়ীর ঘুমের গাঢ়তা দেখে। খুকুর বমির পিক্‌দানী সাফ্ করে পাশের ঘর থেকে অল্প পাওয়ারের নীল আলোর বাল্‌ব এনে সে এঘরের চড়া আলোর বাল্‌বটা বদলে দিল। গুণিয়ার হাতপাখার বাতাস ও কপালে ঠাণ্ডা জলের পটীর মধ্যে যন্ত্রণায় কতক আরাম পেয়ে খুকু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। গুণিয়া ভেবেছিল খুকুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে চলে যাবে। কিন্তু খুকুর জ্বর যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে মনে হচ্ছে। নিশ্বাস উত্তপ্ত। মাথা, কপাল, কাণ আগুন। মাঝে মাঝে চম্‌কে চম্‌কে উঠছে জ্বরের ঘোরে।

নাঃ, খুকুকে এ অবস্থায় ফেলে চুপিচুপি চলে যাওয়া অসম্ভব।

একেবারেই অসম্ভব। এই মা-হারা শিশু এ কি বাঁচবে, সে যদি ফেলে পালায়! ঐ ঝাঁকড়া চুলী মাদ্রাজী বুড়ী আর ঐ মেড়ো বেহারীটার সাধ্যি কি, এই রোগা মেয়েকে সুস্থ করে তোলে। কতো যত্নের খুকুভাই! মা কতো সাবধানে কতো ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে মানুষ করতেন—তার চেয়ে কে আর বেশী জানবে? খুকুর যত্নের ভার অন্য কারুর উপরে দিয়ে মায়ের বিশ্বাস ছিল না একমাত্র গুণনিধি ছাড়া। গুণনিধির মন শিশু-খুকুকে মানুষ করে তোলার অতীত দিনগুলির নানা বিচিত্র ঘটনার ছবিতে তখন চলচ্চিত্রের পর্দ্দার মত ভরে উঠেছে। একটার পর একটা ঘটনার ছবি মনে পড়ে যাচ্ছে! অনেক সুখের, অনেক দুঃখের রংয়ে রঙীন। হঠাৎ খেয়াল হোলো গুণিয়ার, তার পকেটে যে—সিন্দুক থেকে চুরি করা নোট আর গহনা রয়েছে! আঃ! কী যন্ত্রণা হোলো! এক মহাঝঞ্ঝাট সে বাধিয়ে বসেছে! কী করে এখন গহনাগুলো সিন্দুকে তুলে রাখে। নাঃ! এই ছাইপাঁশ জিনিষগুলোর জন্যেই সে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে খুকুর কাছে বসতে পারছে না। এগুলো তাকে পীড়িত অস্থির করে তুল্‌ছে। বার বার মনে হতে লাগলো, এ পাপ যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিয়ে এসে সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। কিন্তু তখন আর তার সে সাহস নেই, সে শক্তি নেই, আবার ড্রয়ারের ভিতর থেকে চাবি নিয়ে সিন্ধুক খুলে জিনিষগুলি যথাস্থানে তুলে রেখে দেওয়ার।

গুণিয়া নড়তে পারল না। ঠায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগলো খুকুর শিয়রে!

খুকু জ্বরের ঘোরে চম্‌কে অস্ফুটস্বরে বললো আমি যাবো—আমি খেলতে যাব মা—গুণিয়া মনে মনে শিউরে ওঠে—জোড়হাত কপালে

ঠেকিয়ে তার দেশের জাগ্রত দেবতা ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের কাছে মানৎ করতে লাগলো খুকুর নিরাময়তার জন্য। খুকু নিরাময় হলে সে ধর্ম্মরাজতলায় সওয়া পাঁচ আনার পূজা দেবে। তখন পূবদিকে সাদা আভা দেখা দিচ্ছে।

কঠিন টাইফয়েড রোগে যমে মানুষে লড়াই চলার পর আটাশ দিনে খুকুর জ্বর ত্যাগ হয়েছে। গুনিয়া সেবা করেছে অসাধারণ। অন্য রোগ নয়, টাইফয়েড রোগের সেবা। দিন এবং রাত্রি সমভাবে সতর্ক প্রহরায় মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

গুণিয়া হঠাৎ কোথা থেকে এল তার মনিব নরেশবাবু কাউকে প্রশ্নই করেননি। খুকুর প্রবল জ্বরের অবস্থায় গুনিয়াকে সেবারত অবস্থায় খুকুর পাশে দেখতে পাওয়াটা সকলকার চোখেই যেন নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনার মতই ঠেকেছিল। সুতরাং সেদিন সকাল বেলায় গুণিয়াকে খুকুর সেবা করতে দেখে কেউই প্রশ্ন করেনি তোমাকে কে আসতে বলেছে, কখন এলে, বা কেন এলে? শুধু দিন সাতেক বাদে ভাত খাওয়ার সময় মহাদেব একবার বলেছিল,—বাবু বুঝি তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? নারে গুনিয়া?

গুণনিধি তপ্তকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, সে খবরে তোর দরকার কি? মহাদেব লজ্জিত হয়ে বলেছিল,—না না, তাই বলছি। ভাগ্যে তুই এসেছিস ভাই, খুকুভাইএর এত বড় অসুখ এ কি ঐ আয়াবুড়ীর দ্বারা কিছু হোত? তুই ওকে ছোট্ট থেকে কোলেপিঠে মানুষ করে তুলেছিস! তোর কাছে ও যতো শান্ত থাকে এমন আর কারুর কাছে নয়। জিজ্ঞেস করছিলুম তুই কখন এলি? সেদিন ভোরবেলায় বুঝি? আমি তো তোকে ভোরবেলাই খুকুভাইয়ের ঘরে দেখলাম।

গুণনিধি মাত্র দু'চার গ্রাস ভাত খেয়েছিল। মহাদেবের প্রশ্নে—বড় ঘটীর জলটা ঢক ঢক করে অৰ্দ্ধেক খেয়ে বাকী জলটা পাতের ভাতে ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বড্ড গা বমিবমি করছে, ভাত গলা দিয়ে গলতে চাইছে না। আমি চল্লুম। খুকুভাই একলা আছে। তোরা বসে খা। কারুর দিকে না তাকিয়ে গুনিয়া রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মহাদেব আশ্চর্য্য হয়ে তার যাওয়ার পথের পানে তাকিয়ে রইলো। ভাত খেতে খেতে হিন্দুস্থানী চাকর বিহারী গম্ভীর ভাবে বল্লো—রাত্রি জাগতে জাগতে বিচারীর তবিয়াৎ খারাব হোইয়েসে। জিউ আচ্ছা নেই।

খুকুর জ্বর ছেড়েছে বটে। উত্থানশক্তি হয়নি। তরল পথ্য তখনও খাওয়ানো হচ্চে। একদিন সকালে টাকার দরকারে নরেশবাবু সিন্দুক খুললেন। টাকা বার করতে গিয়ে টাকা পাওয়া গেলনা।

খুকুর মায়ের সোনার গহনা আর খুকুর হার বালাগুলিও সিন্দুকে ছিল সেও নেই। খুকুর মামা উপস্থিত ছিলেন অনেক খোঁজ তল্লাস করলেন। মিলল না। মামা পুলিশে ফোন করে দিলেন!

গুণনিধি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত খুকুর পাশে বসে আছে। নড়তে চড়তে পারছে না। তার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি যেন অন্তর্হিত হয়েছে। একটা বিরাট শূন্যতায় মন যেন কেমন এক রকম হয়ে গিয়েছে। পুলিশ এসে সার্চ্চ আরম্ভ করলো। প্রথমেই ডাক পড়লো,—চাকরবাকরদের। কোথায় সিন্দুকের চাবি থাকে? ঘরের ঝাড়ামোছা বিছানা পাতার কাজ কোন চাকর করে?

গুণনিধিরও ডাক পড়লো।

নরেশবাবু বল্লেন—আমার চৌদ্দ বৎসরের পুরানো লোক! আত্মীয়ের চেয়েও বিশ্বাসী।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর কথাটা শুনে শুধু একটু হাসলেন, বাঁকা ঠোঁটে।

বুড়ী মাদ্রাজী আয়াটার উপরে তখন বারান্দায় জেরা আর ধমকানি চোখ রাঙানি চলেছে। হঠাৎ বুড়ীটা মাদ্রাজী ভাষায় কি একটা কথা বলে আর্ত্তস্বরে ডুক্‌রে উঠলো।

বুড়ীর কান্নায় অচেতনপ্রায় গুণনিধির পক্ষাঘাতগ্রস্ত সংজ্ঞা যেন চট্ করে ফিরে এল।

সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে খাটে শায়িত খুকুর বিছানাপাতা গদীর তলায় হাত পুরে গোছাভরা নোট ও গহনাগুলি টেনে বার করে সকলের সামনে রেখে দিল।

ঘরশুদ্ধ সকলেই স্তম্ভিত, আশ্চর্য্য। গ্রেপ্তার করবার জন্য ইন্‌স্পেক্টর কনষ্টেবলকে ইসারা করলেন। কনষ্টেবল গুণনিধির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নরেশবাবু বাধা দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বল্লেন,—ও জিনিষ সমস্ত আমিই নিজের হাতে খুকুর গদীর তলায় রেখেছিলাম। খুকুর অসুখের হাঙ্গামায় মেণ্টাল ওয়ারির দরুণ একেবারে স্রেফ্ ভুলে গিয়েছি। কেউই চুরি করেনি।

পুলিশ যদিও একথা একটুও বিশ্বাস করলেনা, কিন্তু এরপরে আর গ্রেপ্তার চলেনা। যাওয়ার সময়ে ইন্‌স্পেক্‌টরবাবু নরেশবাবুকে বাইরে আড়ালে বললেন,—কিছু মনে করবেন না। ভালোর জন্যই বলছি। লোকটিকে যত শীঘ্র পারেন ডিস্‌মিস্ করে দিন। আপনার এই নোবল্‌নেসের মূল্য ওখানে আর পাবেন না।

নরেশবাবু বিবর্ণ অন্যমনস্কমুখে একটু উদাস হাসি হাসলেন মাত্র। কিছু জবাব দিলেন না!

পুলিশদের বিদায় করে দিয়ে এসে নরেশবাবু খুকুর ঘরে এসে দেখলেন গুণনিধি খুকুর বিছানা ছেড়ে ঘরের একধারে একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার বাইরের দিকে শূন্যে নিবদ্ধ।

তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে ডাকলেন গুণিয়া ?

গুণনিধি জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃতের মত ভাবশূন্য চখে কিছুক্ষণ নরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে শুখনো গলায় বললে—

ওগুলো আমি আপনাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম বাবু। মনে ছিলনা মোটে।

নরেশবাবু আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—তাই নাকি ? তাই বল্। এতক্ষণ চুপ করে ছিলি কেন ? কোথায় ওগুলো পেয়েছিলি তুই ? তাইতো আমি ভাবচি, এও কি কখনো সম্ভব ? গুনিয়া—চুরি করবে ? বল্ বল্ কোথায় ওগুলো পেয়েছিলি তুই ?

স্বল্পভাষী ধীর নরেশবাবু পুলকিত উত্তেজনায় বালকেরই মত যেন অধীর হয়ে উঠলেন।

গুণনিধি তেমনিই নিষ্পলক চক্ষে মনিবের পানে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

নরেশবাবু তার কাঁধে একটা ঝাঁকানী দিয়ে বললেন,—চুপ করে থাকিসনি গুণনিধি,—বল্,—কোথায় পেলি ?

গুণনিধি 'ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বললে, কোথাও পাইনি তো বাবু! সিন্দুক খুলে রাত্রে চুপি চুপি চুরি করে নিয়েছিলুম।

অ্যাঃ!—নরেশবাবুর বিস্ময়সূচক শব্দ ঠিক যেন আর্ত্তনাদেরই মত শোনালো।

গুণনিধি কাচের চখের মত স্থির নয়নে ফ্যাকাসে মুখে নরেশবাবুর

পানে তাকিয়ে রইলো। তার মন তখন টাকা ও গহনাচুরির ভয় ভাবনা লজ্জা আতঙ্ক ডিঙ্গিয়ে—মনিবকন্যার টাইফয়েডের স-শঙ্কিত সদাজাগ্রত দুর্ভাবনা পার হয়ে—অনেক দূরে চলে গেছে। দেশের ভাঙা মেটে ঘরে যেখানে তার রুগ্ন স্ত্রী—রুগ্ন কন্যা শুয়ে আছে। সে মনে মনে আন্দাজ করছে তখন,—ছেঁড়া ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে তালপাতার চাটাইয়ের পরে শুয়ে—একটু বার্লির জন্য, এক ফোঁটা ওষুধের জন্য তারা এখনও ছটফট করছে—না—ছট্‌ফটানি চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেছে তাদের !!

রাখাল ছেলের জন্যে রাজার ঝিয়ারী চোখের জল ফেলেছিল—শোনা যায়। কোথায় ছিল অহঙ্কার, কোথায় ছিল ঐশ্বর্য্যের অভিমান, রাজার মেয়ে—রাখাল ছেলের তরেই আকুল; চোখে তার জল। প্রাণের আকর্ষণকে বাধা দেবে কে?

গরীবের ছেলে নিধু—ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের মত ওদের বাড়ী। পাশের বাড়ীর জজবাবু অনেক দিনের পরে দেশে এসেছে পূজো করতে। জজবাবুদের চিররুদ্ধ বাড়ীটা যেদিন সে খোলা দেখতে পেয়ে ভেতরের দিকে তাকালে—হকচকিয়ে গেল। তারপর আরম্ভ হলো ঘনিষ্টতা কুঁড়েতে আর রাজপ্রাসাদে। নিধু দিনের পর দিন বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়। বিস্মিত হয় সে আড়ম্বরে, মুগ্ধ হয় সে ঐ প্রাসাদের বুকে কলমুখরা ছোট্ট একটি গিরিনির্ঝরিনীর মত মঞ্জুর মঞ্জু স্পর্শে।

দিন যায়—নিধু মোক্তারী করে—বাস্তব-জীবনের তিক্ততায় ওর মনে অবসাদ আসে—কিন্তু ঘরে অভাব—ওর মোক্তারীর সামান্য আয় ছাড়া প্রায় অনাহারে থাকে মা বাপ ভাই বোন। তবু মহকুমার সহর থেকে সপ্তাহান্তে একবার দেশে আসার জন্যে মনটা উৎসুক হয়ে থাকে।

নিধুর মনে একটা অসম্ভব কথাও যে ক্ষণিকের জন্যে ডাক দিতনা, এমন নয়। কিন্তু নিধু বুঝত তার অসম্ভাব্যতা কোথায়। নিধু তবু পারত না মঞ্জুকে ভুলতে,—নিধুর জীবনে নিঃসম্পর্কীয়া নারীর স্পর্শ এই প্রথম।

বাধা এল; নিধু যাকে 'হুজুর' বলে এমনি এক মুন্সেফের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের কথাবার্ত্তা শোনা গেল।—সেই আভিজাত্যের প্রাচীর দুজনকে আড়াল করে দিতে চাইলে। দুজনে দুজনের মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকালো—কখন কেমন করে যে ছেলেখেলার ছোট জলরেখায় এসেছে প্রাণের জোয়ার—অন্তরের কুলে কুলে এক অভিনব অনুভূতি। অবাক দুজনে। তারপর?